KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : 28 চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৬
Collection : KLMLGK	Publisher : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title : সমকালীন : (SAMAKALIN)	Size : 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number : ৩২/- ৩২/- ৩৩/- ৩৯/-	Year of Publication : বৈশাখ ১৩৯১ ॥ May 1984 কার্তিক ১৩৯১ ॥ Nov 1984 কার্তিক ১৩৯২ ॥ Nov 1985 কার্তিক ১৩৯৮ ॥ Nov 1991
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

সমকালীন : প্রবন্ধের পত্রিকা

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

ত্রিত্রিংশ বর্ষ ॥ কার্ত্তিক ১৩৯২

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

ছোট পরিবার সুখী পরিবার

স্থায়ীভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য

পুরুষদের ক্ষেত্রে 'ভেসেকটমি' একটি খুব সহজ ও নিরাপদ পদ্ধতি।

- O এজন্য হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় না।
- O এই অপারেশনে মাত্র ২/৩ মিনিট সময় লাগে।
- O অপারেশনের পর সামান্য বিশ্রাম নিয়েই বাড়ী ফিরে যাওয়া যায়।
- O অপারেশনের পর প্রত্যেককে নগদ ১৪৫ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।
- O যে কোন সরকারী হাসপাতালের পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে আজই যোগাযোগ করুন।

বিজ্ঞাপন সংখ্যা : ২২১/৮৫-৮৬

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত

ত্রিত্রিংশ বর্ষ ২য় সংখ্যা কার্তিক তেরশ বিরানব্বই

সমকালীন ।। প্রবন্ধের পত্রিকা

সূচিপত্র

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে একটি 'জননী' প্রতিমা : স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৫

প্রাচীন ভারতে রাজনীতিচর্চা : শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় ৫১

ভারততত্ত্বভাস্কর রমেশচন্দ্র মজুমদার : গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত ৪৭

সমালোচনা ।। প্রস্থানভেদ : কল্যাণী দত্ত ৮৬

দক্ষিণ ২৪ পরগণার লোকশিল্প : দুলাল চৌধুরী ৮৭

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক সুশীল প্রিন্টার্স, ২ ঈশ্বর মিল বাই লেন, কলকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-৮৭ হইতে প্রকাশিত

॥ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশন ॥

চিত্রিতা দেবী'র

পূর্ণের সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ ১৫·০০

কাব্যের মত মনোরম করে রবীন্দ্রনাথের জীবন দর্শনের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা ও কবির অন্তিম মুহূর্তের কিছু বর্ণনা এবং কবি কর্তৃক অঙ্কিত লেখিকার একটি প্রতিকৃতি চিত্র।

ভবানী মুখোপাধ্যায়ের

শরৎচন্দ্র ১০·০০

বাঙালী পাঠকের সেই আপন-মানুষের উপন্যাস প্রতিম জীবন কাহিনী। পড়তে শুরু করলে শেষ না করে ছাড়া যায় না।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

পথের দাবী ২০·০০

শেষের পরিচয় ২০·০০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

শত প্রসঙ্গ (প্রবন্ধ সংকলন) ২৫·০০

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ ফোন : ৩৪-১৭৮২

সংসদের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাদির কয়েকটি

- তে হি নো দিবসাঃ ॥ ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত [৪০·০০]
- ঠাকুরবাড়ির কথা ॥ হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় [২৫· ০]
- সত্যেন্দ্র কাব্যগুচ্ছ (সমগ্র কাব্য একখণ্ডে) ॥ ডঃ অলোক রায় সম্পাদিত [১০০·০০]
- মধুসূদন রচনাবলী (সমগ্র রচনা একখণ্ডে) ॥ ড ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত [৩২·৫০]
- রমেশ রচনাবলী (সমগ্র উপন্যাস একখণ্ডে) ॥ যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত [২৫·০০]
- দীনবন্ধু রচনাবলী (সমগ্র রচনা একখণ্ডে) ॥ ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত [২৫·০০]
- বৈষ্ণব পদাবলী (বৈষ্ণব পদকর্তাদের সঙ্কলিত যাবতীয় পদাবলীর সংকলন) ॥ সাহিত্যরত্ন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত [৭৫·০০]
- ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য ॥ ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত [৩৭·৫০]
- সংসদ বাঙালা চরিতাভিধান (সাড়ে তিন হাজার উল্লেখ্য বাঙালী জীবনী) [৪০·০০]

ঐ সংযোজন খণ্ড [১০·০০] ॥ শ্রীমতী অঞ্জলি বসু সঙ্কলিত

সাহিত্য সংসদ

৩২ এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড : কলিকাতা-৯

সমকালীন

বর্ষ ৩৩ কার্ত্তিক ১৩৯২

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে একটি 'জননী' প্রতিমা

স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়

'পথের পাঁচালীর' ইন্দির ঠাকুরুণ আর সর্বজয়া দুই চরিত্র প্রায় সম্মোহিত করে রাখে আমাদের। একজন বৃদ্ধা-শিশু, অপরজন বধূ ও মা। কিন্তু তখনও স্নেহে নির্মীলিত হয়ে আসেনি এই মায়ের চোখ, বরং শাসনে কঠিন, তবুও চরিত্রে তার মাতৃত্বের রেখা ঋজু; স্পষ্ট একথা বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। ইন্দিরঠাকুরুণ নিশ্চিন্দিপুরের অতীত অধ্যায় যেখানে শেষ হল, সেখানেই বর্তমানের শুরু—সর্বজয়ার 'মা' রূপটির আরম্ভ-পর্ব। সর্বজয়া অল্পবয়সী মেয়ে তখন, জানে তার সংসারের সীমিত স্বর্গকে, হোক দারিদ্র্যের তবু নিজের অধিকারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। হয়তো ইন্দিরঠাকুরুণের অসহায়তার প্রেক্ষিতে তার আচরণ কিছু রূঢ় মনে হয়; কিন্তু 'অপরাজিত' উপন্যাসে যখন পটবদল হল, সেই সময় সর্বজয়া কঠিন অভিজ্ঞতার আয়নায় দেখতে পেয়েছে ইন্দিরঠাকুরুণের একাকীত্ব, মূল্য না-পাওয়া অভিমান। ক্ষমাপ্রার্থনার এই পরোক্ষ নতজানু ভঙ্গিটি দরকার হয়েছিল, তা না হলে সর্বজয়ার মাতৃত্বের বিকাশ বড় অসম্পূর্ণ বোধ হত। জীবনসংগ্রামের স্তর পরম্পরায় এই মাতৃ চরিত্রটি তৈরী হয়েছে, তাই অন্ত্য-পর্বে সর্বজয়ার ভালবাসা এত ব্যাপ্ত। ইন্দিরঠাকুরুণের বার্ধক্যবেলার 'শৈশব'-কে চিনতে পারে বলেই সর্বজয়া গ্লানি, অনুশোচনায় ভরে উঠেছে।

দুর্গা আর অপু—দুই সন্তানের জননী সর্বজয়া কিন্তু তার মাতৃত্বের পূর্ণ উপলব্ধি অপুকে ঘিরেই, আবার 'পথের পাঁচালি'-র সহজ, জীবন্ত বাস্তবতা পরিপূর্ণতায় পৌঁছতে পারে 'সর্বজয়াকে' কেন্দ্র করে। মনে করা যাক সেই ঘটনাটি—অপুকে সর্বজয়া ভাত মেখে গাইয়ে দিচ্ছে—"দেখি হাঁ কর্—তোমার

কপালখানা—মণ্ডা না মেঠাই না, ছুটো ভাত আর ভাত…বাঁচবে কি খেয়ে? বাঁচতে কি এসেছ?" ১

বাঙালি-সংসারে যে মা এমনি করে সন্তানকে নিজের অঞ্চল ছায়ায় টেনে রাখেন, সেই মায়ের মুখচ্ছবি দেখতে পাই। আবার লক্ষ্য না করেও উপায় নেই, সর্বজয়ার চরিত্র-চিত্রণকে মাঝখানে রেখে পারিপার্শ্ব কি আশ্চর্য নিখুঁত ও সপ্রাণ। প্রতিদিনের সময়-প্রবাহ আর উপন্যাসে-পাওয়া ছবির মধ্যে জীবন-উত্তাপের দিক থেকে তফাৎ প্রায় নেই।

সর্বজয়াও সব মায়েরই মত পরিণত-পর্বে এসে সামান্য বেদনা অনুভব করেছে—'অপু'-র সবটুকু যেন তার মায়ের আয়ত্বে আর নেই। ব্যক্তিত্বময়, গভীর মনের 'অপু' হয়তো সমীহের, কিন্তু অজস্রধারে যে স্নেহ ক্ষরিত হয় তা কার উপর বর্ষণ করবে সর্বজয়া? পারতো সেই অপুর ওপর, যে অপু আদরে আবদারে তার মাকে ব্যতিব্যস্ত করতো; ভরিয়েও রাখতো। সন্তানের প্রতি এই স্নেহ প্রায় ঈশ্বরানুভূতির পর্যায়ে পৌঁছে গেছে অন্তিমলগ্নে। 'মৃত্যু'-কে সর্বজয়া গ্রহণ করেছে 'অপু' মনে করেই আর সেই অপু তার কোল-সংলগ্ন ছোট্ট অপু—বয়স্ক অপূর্ব নয়।

বস্তুত, বাংলা-সাহিত্যে জননী-সত্তার প্রকাশ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতই যেন স্বতঃস্ফূর্ত। নারীর এই গরীয়সী ভূমিকাটি কখনও একক, কখনও প্রিয়ার অনবদ্য মাধুর্যের সঙ্গে মিশে থেকেছে। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসে এক অম্লান জননী-প্রতিমা 'আনন্দময়ী', যিনি "চিন্তা করেন কম, অনুভব করেন বেশি,…সত্যকেও সহজে অনুভব করেন মনের মধ্যে।"২ এই অসামান্য চরিত্রটি ক্রমবিকশিত হয়ে অবশেষে প্রতীক হয়ে ওঠেন সমগ্রত কল্যাণ ও মঙ্গলের।—"তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই—শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা। তুমিই আমার ভারতবর্ষ।"৩ এই আদর্শগত পর্যায়ে উপনীত হয়ে আনন্দময়ী হয়ে উঠেছিলেন বিরাটত্বের চুম্বক—সংসারে মূর্তিমতী কল্যাণ। পরবর্তীকালে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসেও মা-এর মহিমান্বিত মূর্তিই কল্পনায় ধরা পড়ে। যেমন শরৎচন্দ্রের 'বিন্দুর ছেলে'তে বিন্দুর অভিমানী অন্তরে ফল্গুস্রোতসম মাতৃস্নেহ দেখে অভিভূত হই, কিন্তু প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কিত আলোচনায় বুদ্ধদেব বসুর একটি কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ না করেও পারি না; "আমরা পৃথিবীটাকে সুস্পষ্ট ভালো-মন্দে বিভক্ত দেখতে চাই; নিজেকে দেখতে চাই ভালোর সঙ্গে একাত্ম,…।"৪ সর্বজয়ার জননীমূর্তি, স্নেহের এমন অনাবিল প্রকাশ বাস্তবিক 'পথের পাঁচালি' তথা বাংলা-সাহিত্যের অপূর্ব সম্পদ, সন্দেহ নেই। কিন্তু তার স্বাভাবিক, জটিলতা-বর্জিত মাতৃস্নেহ 'পথের পাঁচালি'-র মহাকাব্যিক সুরসুন্দরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। তরুণী গ্রাম্য-বধূ সর্বজয়া আর বৃদ্ধা, জীবন-যুদ্ধের পরম সাক্ষী শ্রান্ত সর্বজয়ার এগিয়ে চলার সমান্তরালে তার মমত্ব, অপুর প্রতি নিবিড় স্নেহ অশ্রান্ত জীবন-কল্লোলের কোলাহলে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। সর্বজয়ার জননী-চেতনাকে কথাশিল্পী তাঁর উপন্যাসে একমাত্র উপজীব্য বিষয় রাখতে চেয়েছিলেন, জোর করেই বলা যায় না। সুতরাং বিরাট অথচ মাটির পৃথিবীর সঙ্গে সুন্দরভাবে মিলিত থাকা, দৈনন্দিন জীবনে দেখতে পাওয়া মাতৃ-সত্তার বহু সম্ভাবনা সত্বেও সর্বজয়া মহৎ জীবন-সঙ্গীতেরই অন্যতম প্রকাশ হয়ে গেছে।

সত্যই বাংলা-সাহিত্যে 'জননী' রূপটি সবচেয়ে বেশি আঁকা হয়েছে; অনুরূপা দেবীর 'মা' তার একটি ঘনিষ্ঠ উদাহরণ কিন্তু প্রতি মুহূর্তে মহত্ব, উদারতা—যে গুণগুলি জ্যোতিষ্কের মত জলজল করে

আমাদের মনের মধ্যে, তার সঙ্গে সঙ্গতি রাখে এই সব মাতৃরূপ। 'মা' বলতে গেলেই অসীম মহিমময়ী একটি বিশাল-চেতনা কল্পিত হয়—বাংলা-সাহিত্য সেদিক থেকে প্রত্যাশা পূরণ করে। 'মা'-র মানবীরূপ, স্নেহ, নীচতা, ক্ষুদ্রতা, স্বপ্ন, আশাভঙ্গ এবং আশায় বুকবেঁধে সন্তানের মধ্যে নিজের সত্তাকে বারবার প্রত্যক্ষ করার দৃষ্টান্ত হিসাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জননী' উপন্যাসে শ্যামা আশ্চর্যজনকভাবে সফল। সর্বজয়া-চরিত্রে যার আভাস, তারই সুন্দর পরিণাম 'জননী' উপন্যাসের জননী 'শ্যামায়'।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাশিল্প প্রসঙ্গে অনিবার্যভাবে মনে পড়বে 'পদ্মানদীর মাঝি', 'পুতুল-নাচের ইতিকথা', 'অহিংসা', 'দিবারাত্রির কাব্য' ইত্যাদি। মনস্তত্বের তির্যক রেখায় জীবন কত বিসর্পিত, আকর্ষণীয়, বুদ্ধির অভিক্ষেপে কি আশ্চর্যজনকভাবে জটিল—অনুভব করি। 'কুসুম', 'শশী', 'হোসেন মিয়া', 'কুবের', 'সুপ্রিয়া', 'হেরম্ব'—আকর্ষণ-বিকর্ষণের পালায় তৈরী হওয়া নর-নারীর চিরন্তন সম্পর্কে, বিচিত্র মানব চরিত্রের দর্পণে প্রতিবিম্বিত অজস্র বাঁকানো মনস্তাত্বিক ভঙ্গি দেখে স্তম্ভিত, আহত, সন্ত্রস্ত, ভীতও হই কিন্তু এরই পাশে থেকে যায় কি অত্যাশ্চর্য এক উপন্যাস 'জননী'—একজন 'মা'—তার এই একটি মাত্র সত্তাকে কতভাবে প্রকাশ করে চলেছে এই উপন্যাসে—বিস্মিত হতে হয়।

শুধুমাত্র নিখাদ জননী-সত্তার প্রকাশ নিয়ে যে একটি পূর্ণাঙ্গ শিল্পকর্ম সম্ভব, অন্তত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'জননী' (:৩৩৫) সেই পদক্ষেপ বাংলা-কথা-শিল্পে রচনা করেছে। কথারম্ভ থেকে উপন্যাসের শেষ পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায় এক জননী-চরিত্রের নানা কৌণিক প্রতিফলন। নায়িকা শ্যামার চারিত্রিক লক্ষণই হল জননীত্ব। অর্থনীতিনির্ভর বাস্তবতা ও জীবন-সংগ্রামকে কেন্দ্র করে ঘটনাপ্রবাহ অবিরামভাবে ঘূর্ণিত হয়েছে, সেখানে স্রোতের মুখে খড়কুটোর মত শ্যামা নিজের অস্তিত্ব প্রবল প্রয়াসে রক্ষা করে চলে—এই অবস্থায় তার মনের ছোট্ট ছোট্ট বাঁকাভঙ্গিও দেখতে পাই। হয়তো প্রত্যাশা করতে থাকি 'শ্যামা' চরিত্রের ক্রমবিবর্তন। শ্যামা অপরিবর্তনীয় একটি চরিত্র—তার মাতৃত্ব অন্যখাতে বাঁক নেয়নি। 'জননী' উপন্যাস এই পরিচয়েই গুণান্বিত। নারীর চরিত্রে পূর্ণতা মাতৃরূপের মধ্যে দিয়েই আসে। কিন্তু অসংখ্য সূক্ষ্মসত্তার যোগফল তার চরিত্রে নিহিত, অস্বীকার করা যায় না। দয়িতারূপের অন্তরালে মাতৃত্ব মিলে-মিশে থাকে, আবার একই সত্তায় বাস করে কৈশোরবেলার চাপল্য, স্নেহ পাওয়া ও দেওয়ার মধুর লীলা অর্থাৎ একই সঙ্গে ভগ্নী, কন্যা, জায়া, প্রেমিকা, মা—অনেক বর্ণময় বিক্ষেপ রমণী-চরিত্রে। এর মধ্যে কার কোন বৈশিষ্ট্য প্রধানভাবে আত্মপ্রকাশ করবে সেটি নারীর ব্যক্তি-চরিত্রের ওপর নির্ভর করবে—যেমন 'পুতুলনাচের ইতিকথা'-য় কুসুমের জটিল নারীসত্তায় প্রেমের জন্য তৃষ্ণার তাপ যেন মনে এসে লাগে। কিন্তু 'জননী' উপন্যাসে 'শ্যামা' প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মা। পরে সে স্ত্রী। উপন্যাসের মধ্য পর্বে কখনও কখনও শ্যামার মনে স্বামীর ভালবাসা সম্বন্ধে অস্পষ্ট স্বরে আকাঙ্ক্ষা যে জাগেনি তা নয়। প্রথম যৌবনে শীতলের খামখেয়ালি স্বভাবের জন্য শ্যামা স্বামী সম্বন্ধে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছে। উত্তরকালে শীতল সম্পর্কে কখনও বিতৃষ্ণা, ক্রোধ, করুণা, কদাপি মমতা জেগে উঠেছে। স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরকে আবিষ্কার করার নীরব নবীনতা বুঝি শ্যামা কোনদিন বুঝতে পারেনি। কিন্তু নারীত্বের গভীর অবচেতনে খুব নিমেষের

জন্য হলেও থেকে যায়—"ধানকলের চোঙাটার কুণ্ডলী-পাকানো ধোঁয়া উত্তরে উড়িয়া যায়, মধ্যাহ্নে যে মৃদু উষ্ণতা অনুভূত হয়, তাহা যেন যৌবনের স্মৃতি···শহরতলীতে বন-উপবনের বসন্ত আসিলেও জীবনে কবে তাহার যৌবন ছিল, তা কি শ্যামার মনে পড়া উচিত ?"৫

কিন্তু উপন্যাসকার সংক্ষেপে আর একটি কথাও যোগ করে দিয়েছেন, যেখানে 'শ্যামা' চরিত্রের মূল সুরটি বাঁধা।—"কিন্তু জননী শ্যামা, তুমি আবার ছেলে চাও, শুনিলে দেবতারা হাসিবেন যে, মানুষ যে ছি ছি করিবে।"৬

কিন্তু 'ভ্রোণপদীর শাড়ির' মত অফুরন্ত জননী-চেতনা নিয়েই যে শ্যামার অস্তিত্ব। বসন্ত দিনের আহ্বানকেও তা আবর্তিত করে। শীতলের প্রতি অনুরাগ বা তজ্জনিত আকাঙ্ক্ষা এই মৌল সত্যকে অতিক্রম করতে কখনই পারেনি। কিন্তু দায় ছিল শীতলের মনে। প্রবল অধিকারের গণ্ডীতে জননী শ্যামা যত সহজ, অকপট, তার তিনটি সন্তান ও সাবলীলতায় মায়ের কাছেই নিবিড় হয়ে থাকে। শীতলের সঙ্গে কিছু দূরত্ব বোধ করে তারা।

শীতল না পারে তার পিতৃত্বের জোর খাটাতে, না পায় স্ত্রীর সামীপ্য। জননী শ্যামা শীতলের কাছেও ফিরে আসতে পারে না। অনেক ব্যবধান হয়ে গেছে শুধু মাঝখানে বাস করে তাদের সন্তানেরা।—"দুঃখ মুছিয়া লইবার, আনন্দ দিবার, শান্তি আনিবার ভার শ্যামাকে শীতল কোনদিন দেয় নাই।···শ্যামাকে সে কবে জানিতে দিয়াছিল যে, তার মধ্যেও এমন কোমল এক অংশ আছে, যেখানে প্রত্যহ প্রেম সহানুভূতির প্রলেপ না পড়িলে যন্ত্রণা হয় ?···আপন প্রতিভায় সৃজিত সংসারে শ্যামা ডুবিয়া গিয়াছে। শীতল সেখানে ঢুকিবার রাস্তা না খুঁজিলেই সে বাঁচে।"৭

মনে হতে পারে, "শ্যামা জননীরূপের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দিয়েছে, তার প্রধান কারণ, তার বঞ্চিত বধূসত্তা '···শ্যামার জননীরূপের ঐশ্বর্যময়ী মূর্তির অন্তরালে এই গোপন বেদনার উৎসটি উদ্ঘাটিত করে শ্যামা চরিত্রের বাস্তবতাকে লেখক জীবন্ত করে তুলেছেন।"

শ্যামার জীবনে একসময়ে শীতল ছাড়া কেউ ছিলনা কিন্তু সর্বকর্তৃত্বময়ী শ্যামাকে শীতল ভয় পায়। নিজেকে তার 'স্বাধীনতাবিহীন স্বাতন্ত্র্যবিহীন জড় পদার্থের মত' মনে হয়। অবশ্যই শ্যামা 'আপন প্রতিভায় সৃজিত সংসারে'—এই অসাধ্যসাধন করেছে ; কিন্তু 'বঞ্চিত বধূসত্তা'-র পরিপূরকতার জন্য শ্যামা জননীরূপে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে, এ-মত দ্বিধাতীত হওয়ার অবকাশ আছে। সাতবৎসর বিবাহ হওয়ার পরও নিঃসন্তান শ্যামা শুধু সন্তানকামনাতেই অধীর হয়ে গেছে। যদিও তার মানসিকপরিপূর্ণতার কথা ভাববার মত মন শীতলের নেই, স্ত্রীর জন্য সময় ব্যয় করতে হয় এ-বোধ তার নেই ; কিন্তু শ্যামাও কি সম্পূর্ণভাবে নিজের শূন্যতা বোঝে ? তাই যৌবন-সায়াহ্নে শীতলের শ্যামার কাছ থেকে যখন মানসিক প্রত্যাশার জাগরণ ও ব্যর্থতায় প্রবল ক্রোধ দেখা দিল—"ছেলে ছেলে করে তুমি এমন হয়ে গেছ, তোমার সঙ্গে মানুষ বাস করতে পারে না।···জন্তুর মত হয়ে গেছ তুমি,—টাকার কথা ছাড়া এক মিনিট আমার সঙ্গে অন্য কথা কইতে তোমার গায়ে জ্বর আসে, মন খুলে স্বামীর সঙ্গে মেশার স্বভাব পর্যন্ত তোমার ঘুচে গেছে,···রক্তমাংসের মানুষ তুমি নও, লোভ করার যন্ত্র !"৯

এই বিস্ফোরণ যত স্বাভাবিক, ততোধিক স্বাভাবিক মনে হয় শ্যামার প্রতিক্রিয়া,—"শোন

একবার শীতলের কথা। কিসে মহাপাপী শ্যামা ? কোনদিন চোখ খুলিয়া পুরুষের দিকে চাহিয়াছে ? অসৎ চিন্তা করিয়াছে ? দেবদ্বিজে ভক্তি রাখে নাই ?···শীতল তাহাকে বকে ? যার সংসার সে মাথায় করিয়া রাখিয়াছে ? যার ছেলেমেয়ের সেবা করিয়া তাহার হাতে কড়া পড়িয়া গেল, ইত্যাদি।"·০ শ্যামা তার এই মন নিয়ে খেয়ালী শীতলের মনের সূক্ষ্মজগতের খবর কি করে পায় ? নিজের মনের সংবাদও তার কাছে স্পষ্ট নয়, সন্তান নিয়ে যে জীবন, তারই সব কিছুই নখদর্পণে শ্যামার। সেখানেই সে সুখী, আত্মতৃপ্ত।

প্রকৃতপক্ষে শ্যামার জননী-চেতনাকে তিনটি স্তরে দেখতে পাই। সাতবছর বাদে প্রথম মাতৃত্বের আনন্দে বিভোর যে তরুণী শ্যামাকে দেখি তা যেন তার জননী-চেতনার প্রাক্‌কথন—"কতটুকু মুখ, কী পেলবতা মুখের !···বেদানার জমানো রসের মত তুলতুলে আশ্চর্য দুটি ঠোঁট। একি তার ছেলে ? এই ছেলে তার ?···শ্যামা কাঁপিয়াছিল, শ্যামার হইয়াছিল রোমাঞ্চ। স্নেহ নয়, তাহার হৃদয় যেন ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিয়া তাহার কণ্ঠ রোধ করিয়া দিতে চাহিয়াছিল।"১১

এই নবলব্ধ অনুভূতির ভূমিকা পর্বে শ্যামা প্রবল আবেগে নিজেকে আবিষ্কার করতে পেরেছে। কিন্তু প্রথম মাতৃত্ব তার ব্যর্থ হল। বিধান দ্বিতীয় সন্তান। শ্যামা ততদিনে প্রাথমিক বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠেছে।

মধ্যপর্বে জননী শ্যামা এবং স্বামী শীতলের সম্পর্কের একটি জটিল, মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্কের আভাস দেন কথাশিল্পী। বস্তুত শ্যামার প্রতি শীতলের যে অভিযোগ—স্বামী নয়, টাকার প্রতি লোভী শ্যামা, সন্তানের জন্য উন্মাদ তার স্ত্রী—এ-সবই কিন্তু শ্যামার সন্তান-স্বপ্নেরই অনুষঙ্গ। তার প্রাণের শরিক ছেলেমেয়েরা যেমন বড় হয় তেমনি করে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নও লালিত-পালিত হচ্ছে। শ্যামা সুখী হয় শরীর ও মনে অন্তঃশীল স্বপ্নে।

উপন্যাসে এই সময়ে যদি কারোর অবচেতন পূর্ণমাত্রায় ফুটিয়ে তুলতে চেয়ে থাকেন কথাশিল্পী তাহলে তা 'শীতলের'। হয়তো সংসারে নিষ্প্রয়োজন বলেই হতাশ শীতল বারবার নিয়মভাঙার কাজ করে, জেলে যায়।

শ্যামার আর্থিক সংগ্রামের যে স্পষ্ট চেহারা দেখি তা তার মাতৃমনের স্বপ্নেরই ভাঙাচোরা চেহারা।

উপসংহারে শ্যামার নিজস্তি, অতীত থেকে ভবিষ্যতের পথে যেখানে তার প্রথম মাতৃত্বকে টিকিয়ে রাখবার উন্মাদনাময় প্রচেষ্টাও পরাজয় লক্ষ্য করা গিয়েছিল তারই যেন পুনরাবৃত্তি দেখা গেল অর্থ-পাগল 'শ্যামার' ভবিষ্যতের সমৃদ্ধিকে লালন করার আশ্চর্য উদ্যম ও হতাশায়। শ্যামা কিন্তু উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাই অন্তঃশীলা বকুলের সেবা করে উন্মুখ মন নিয়ে। কিন্তু বকুলের মেয়ের সুন্দর চোখ দেখে ঈর্ষিত হয় তার মাতৃ অন্তর—এই হৃদয়টি যে অধিকার করে আছে তার নিজের চক্ষুহীন আরেক মেয়ে। প্রতিনিয়ত মাতৃমনের বৈচিত্র্যময় মনস্তত্ত্ব পাঠকের নবালোকিত মনে হতে পারে।

জননী বলেই শ্যামা বিধানের স্ত্রী সুবর্ণকে ঈর্ষা করে। কারণ মা'-র অবুঝ অধিকার প্রবল ভালবাসা ;—একদিকে স্নেহ নিবিড় বলেই সন্তানের সুখ চেয়েছে, অন্যদিকে তার ছেলে অন্য এক

নারীর মমত্বে ডুবে যায়, তা তীক্ষ্ণ সূচিমুখ বেদনায় যেন জননী শ্যামার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ আনে। নিরপরাধ সুবর্ণর প্রতি অহেতুক জ্বালা শ্যামার।

'ছেলে একটি যৌবনোচ্ছলা মেয়েকে বাছিয়া বিবাহ করিয়াছে বলিয়া জননীর কি এমন অবুঝ হওয়া সাজে?'১২ জিজ্ঞাসা নিজেকে শ্যামার—কোথায় তার শূন্যতা? সুবর্ণকে অকারণে তিরস্কার করে কাঁদতে বসে নিজেই। এই লাঞ্ছনা তো বিধানের প্রতিই নিক্ষেপ করা হল? যে বিধানকে নিয়ে শ্যামা পূর্ণতার স্বাদ পেয়েছিল, মাতৃসত্তার সঙ্কটময় সবকটি মুহূর্ত শ্যামাকে পেরিয়ে আসতে হয়েছে, যা তার আর্থিক নিরাপত্তাহীন জীবনযুদ্ধের চেয়ে কম বিপজ্জনক নয়। কিন্তু শ্যামা পরাস্ত হয়নি, শ্যামা আবার বেঁচে উঠেছে বিধানের সন্তানকে ক্রোড়ে নিয়ে—"একে একে দিন গেল। ঋতু পরিবর্তন হইল জগতে। শীত আসিল, শীতল পরলোকে গেল, শ্যামা ধরিল বিধবার বেশ, তারপর শীতও আর রহিল না। সুবর্ণকে শ্যামা যেন বুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া একটি দিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, কোথায় গেল ক্ষুদ্র বিদ্বেষ, তুচ্ছ শত্রুতা!...জানালার অল্প একটু ফাঁক দিয়া আকাশের কয়েকটা তারা দেখা গেল আর শ্যামার কোলে স্পন্দিত হইতে লাগিল জীবন।"১৩

কি অসাধারণ অর্থব্যঞ্জক ভাষা প্রয়োগ—'শ্যামা ধরিল বিধবার বেশ, তারপর শীতও আর রহিল না।' শ্যামার জীবনে শীত স্থায়ী নয়, স্থায়ী বসন্তের নবোদ্গম পল্লব তাই শিশুর কোমল মুখই তার মানসিক আনন্দ, বাঁচার মন্ত্রধ্বনি। শ্যামার চরিত্র পাঠে মনে হয় এ যেন এক আদিম মা—মাতৃত্বের অসীম ক্ষুধা নিয়ে সে সজীব, প্রবলভাবে জীবন্ত। জননী উপন্যাসে এই প্রাণবন্ত, সন্তান বুভুক্ষার চিরন্তন চিত্র কম আগ্রহোদ্দীপক নয়, বরং এই সত্তার অনন্তকাল নিজেকে খুঁজে ফেরার তীব্র আনন্দ ও রোমাঞ্চ রোমান্টিক চেতনার চেয়ে কম বর্ণাঢ্য নয়। 'শ্যামা' চরিত্রের শুরু যেখান থেকে ঔপন্যাসিক তার পথহাঁটার বিরামচিহ্ন এঁকেছেন ঠিক সেইখানটিতে যেখানে 'শ্যামা' আবারও যেন সুবর্ণর মধ্য দিয়ে 'জননী' হতে পারলো—ভাবীকালে সঞ্চিত সুখের সম্ভাবনা রেখে দিল।

'জননী' শ্যামা বাংলাসাহিত্যে অপূর্ব মনস্তত্ত্ব ও মাতৃহৃদয়ের বিচিত্র তথ্যের সমন্বয়ে এক বিরল চরিত্র।

সহায়ক গ্রন্থতালিকা:—

১. 'পথের পাচালী' "বিভূতি-রচনাবলী প্রথম খণ্ড।" পৃঃ ৪২ ২. বুদ্ধদেব বসু, 'গোরা', 'রবীন্দ্রনাথ: কথাসাহিত্য।" পৃঃ ৬৮ ৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "গোরা" ৪. বুদ্ধদেব বসু, 'প্রমথ চৌধুরী'. "কালের পুতুল।" পৃঃ ২০ ৫. 'জননী', মানিক-গ্রন্থাবলী ২য় খণ্ড। পৃঃ ৮১ ৬. ঐ ৭. ঐ। পৃঃ ৫৭ ৮. ডঃ গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, "দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাঙলা কথাসাহিত্য।" পৃঃ ৩৩৭ ৯. 'জননী',। পৃঃ ৫৯ ১০. ঐ। পৃঃ ৬০ ১১. ঐ। পৃঃ ১১ ১২. ঐ। পৃঃ ১৫৯ ১৩. ঐ। পৃঃ ১৬৫

প্রাচীন ভারতে রাজনীতিচর্চা

শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাচীন ভারতবর্ষে কেবলমাত্র ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রেই অসামান্য উন্নতি দেখা গিয়েছিল তাই-ই নয়, রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রেও ভারতীয় আচার্যগণের আগ্রহ ও সূক্ষ্মদর্শিতার অভাব ছিল না। সাধারণভাবে প্রাচীন আচার্যদের মতে বিদ্যার চারপ্রকার ভাগ ছিল—যুক্তিবিদ্যা বা দর্শন, ত্রয়ী বা বেদ, বার্তা বা অর্থনীতি এবং দণ্ডনীতি বা রাজনীতি। প্রাচীন রাজনীতিবিদ্ কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে এই চারপ্রকার বিদ্যার উল্লেখ করেছেন—আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্তা দণ্ডনীতিশ্চেতি বিদ্যাঃ—১/২। মহাভারতেও চতুর্বিদ্যার কথা বলা হয়েছে এবং কামন্দকী নীতি ও শুক্রনীতি গ্রন্থে কৌটিল্যের অভিমতেরই অনুবর্তন করা হয়েছে। তবে চারপ্রকার বিদ্যাকে স্বীকার করলেও মহাভারতকার দণ্ডনীতিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে দণ্ডনীতির উপর যথোপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ না করলে বেদবিদ্যা এবং অন্যান্য সকল ধর্ম বিনষ্ট লাভ করে—মজ্জেত্ ত্রয়ী দণ্ডনীতৌ হতায়াং সর্বে ধর্মাঃ প্রক্ষয়েয়ুঃ | শান্তিপর্ব, ৬৩/২৮ রাজনীতির গুরুত্ব অন্যান্য আচার্য প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়েও দেখা যায়। যেমন—মনুপ্রতিষ্ঠিত মানব সম্প্রদায়ীগণ তিনপ্রকারের বিদ্যাকে স্বীকার করেন—বেদবিদ্যা, অর্থবিদ্যা ও রাজনীতি। বার্হস্পত্যসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত যাঁরা তাঁরা মনে করেন বিদ্যা কেবলমাত্র দুটি—অর্থনীতি ও রাজনীতি। পক্ষান্তরে আচার্য উশনার অনুবর্তীগণ দণ্ডনীতিকেই একমাত্র বিদ্যা বলে মনে করেন, কারণ অন্য সকল বিদ্যার সার্থকতা দণ্ডনীতির উপরেই নির্ভরশীল।

সুতরাং দেখা যায় যে রাজনীতির গুরুত্ব অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে স্বীকৃত হয়ে আসছে। রাজনীতিকে তাঁরা শিক্ষণীয় বিদ্যার বিভিন্ন শাখার মধ্যে অন্যতম একটি শাখা বলে গণ্য করতেন এবং শাসনব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে এই বিদ্যাকে সহায়ক বলে মনে করতেন। তবে সেযুগে সমাজের অভিজাত শ্রেণীর মধ্যেই সাধারণতঃ এই জ্ঞান সীমাবদ্ধ থাকতো। রাজনৈতিক তরঙ্গভঙ্গে জনসাধারণের বিশেষ কোনো ভূমিকা ছিল না, কিংবা কোনো সম্পূর্ণ ও সুসংহত রাজনৈতিক মতাদর্শ গড়ে তোলার দিকে সে যুগে বিশেষ ঝোঁক দেখা যায় না। মৌর্যযুগের প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ্ কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্র নামক গ্রন্থের প্রারম্ভে বলেছেন—পৃথিব্যা লাভে পালনে চ যাবন্ত্যর্থ শাস্ত্রাণি পূর্বাচার্যৈঃ প্রস্তাপিতানি প্রায়শস্তানি সংহৃত্যৈকমিদমর্থশাস্ত্রং কৃতম্—অর্থাৎ রাজ্যপ্রাপ্তি ও পালন সংক্রান্ত বিষয়ে পূর্বাচার্যগণের মতামত সংগ্রহ করেই অর্থশাস্ত্র সংকলিত। শুক্রনীতি নামক আর একটি প্রাচীন রাজনীতি-বিষয়ক গ্রন্থে বলা হয়েছে যে দণ্ডনীতির জ্ঞান মহীপতিকে শত্রুগণের উপর বিজয়লাভ করতে, প্রজাবর্গকে সন্তুষ্ট রাখতে এবং রাজ্যপরিচালনাকার্যে দক্ষতা অর্জন করতে সাহায্য করে। ১/৬-৭ সুতরাং স্পষ্টতঃই সে যুগে রাজনীতির জ্ঞান কোনো বিশেষ মতবাদ নির্ভর ছিল না, তা ছিল প্রয়োগ-নির্ভর এবং এক সার্বিক কল্যাণ চেতনায় উৎসারিত। আর সেই কারণেই রাজনীতিবিষয়ক কোনো আলোচনায় নিছক যুক্তি নির্ভরতার চেয়ে নৈতিক ভাবালুতার বিলাসই বেশী লক্ষ্য করা যায়।

মহাভারতে রাজনীতিবিষয়ক শাস্ত্রের উৎপত্তি বিষয়ে একটি পৌরাণিক আখ্যান পাওয়া যায়।

সেখানে বলা হয়েছে যে ব্রহ্মা আপন প্রজ্ঞাবলে শতসহস্র অধ্যায়ে ধর্ম, অর্থ ও কামকে বিষয়বস্তু করে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। (শান্তিপর্ব ৫৯/২৯) এই গ্রন্থের একটি বৃহৎ অংশ রাজ্যশাসন অর্থাৎ রাজ্যের বৃদ্ধি, রক্ষণ এবং বিনাশ সম্বন্ধে আলোচনা ছিল। এই গ্রন্থে রাজা, অমাত্যবর্গ ও জনগণের কর্তব্য এবং তৎসম্পর্কিত অন্যান্য ব্যাপারেও বিশদ আলোচনা করা হয়েছিল। শিব প্রথমে এই গ্রন্থ পাঠ করেন এবং মনুষ্যসমাজের উপকারার্থে তাকে সংক্ষিপ্ত রূপ প্রদান করেন। পরে ইন্দ্র, বৃহস্পতি, শুক্র প্রভৃতি অন্যান্যগণকর্তৃকও এই গ্রন্থের সংক্ষেপিত রূপ প্রচারিত হয়। (শান্তিপর্ব ৫৯/২৮)

দণ্ডনীতি নামের উৎপত্তি প্রসঙ্গে মহাভারতেই বলা হয়েছে—"ব্রহ্মা বলেছিলেন, যেহেতু দণ্ডের (শাসনব্যবস্থার) দ্বারা মনুষ্যসমাজ পরিচালিত হয় অথবা দণ্ডই সমস্ত কিছু পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে, সেজন্য এই শাস্ত্র ত্রিভুবনে দণ্ডনীতি নামে পরিচিত হবে।"—

দণ্ডেন নীয়তে চেদং দণ্ডং নীয়তি বা পুনঃ।
দণ্ডনীতিরিতি খ্যাতা ত্রীঁল্লোকানভিবর্ততে॥ (শান্তিপর্ব ৫৯/৭৮)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে অতি প্রাচীনকালেই ভারতবর্ষে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করা হয়েছিল। মহাভারতের রাজনীতিশাস্ত্রের উৎপত্তিবিষয়ক আখ্যানটি কাল্পনিক হলেও বিষয়টির প্রাচীনত্বকে নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠিত করে।

সুদূর অতীতকালে প্রাচীন ভারতবর্ষে যে ধরণের শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল এবং যে আদর্শ অনুযায়ী এই শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হত তার উল্লেখ আমরা বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থেই পাই। এই ধরণের গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ্য বেদ, পুরাণ, রামায়ণ-মহাভারত, বিভিন্ন স্মৃতিগ্রন্থ, বৌদ্ধ ও জৈনধর্মবিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ, বিভিন্ন ঐতিহাসিক গ্রন্থ এবং নাট্যরচনা, বিদেশী পর্যটকদের বিবরণী, লেখতত্ত্ববিষয়ক প্রমাণাদি এবং বিশেষতঃ কেবলমাত্র রাজনীতিবিষয়েই আলোচনামূলক কয়েকটি গ্রন্থ।

ভারতীয়গণের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কিছু উল্লেখ ছাড়া সেই যুগের রাজনৈতিক অবস্থা বা শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে বেশী কিছু জানা যায় না। পরবর্তী বৈদিক গ্রন্থে যেমন ঐতরেয় ব্রাহ্মণে, শতপথব্রাহ্মণে এবং অথর্ববেদে অবশ্য এ সম্বন্ধে যথেষ্ট তথ্য পাওয়া যায়।

প্রকৃত অর্থে রামায়ণ ও মহাভারতকে ঐতিহাসিক কাব্য বলা যায় না ঠিকই, কিন্তু এই দুই মহাকাব্য সে যুগের ভারতীয় আর্যদের জীবনযাত্রার প্রায় নিখুঁত একটি ছবি তুলে ধরে। এই দুই মহাকাব্যে বর্ণিত ঘটনাবলীতে অনেকটাই সত্যতা আছে এবং যদিও উভয় মহাকাব্যেরই বিষয়বস্তু যুদ্ধকেন্দ্রিক, তাহলেও এই দুই গ্রন্থেই আমরা প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক মতাদর্শ, শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ে অনেক তথ্য পাই। মহাভারতে বেশ কয়েকটি অধ্যায়ে আলাদা করে রাজাদের কর্তব্য এবং প্রজাগণের অধিকার ও দায়িত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

ধর্মশাস্ত্রবিষয়ক যে সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থ বর্তমানে আমরা পাই সেগুলির প্রাচীনতর কোনো উৎস ছিল যেগুলিকে ধর্মসূত্র আখ্যা দেওয়া হয় এবং এগুলি গদ্যে লিখিত ছিল। এই সমস্ত ধর্মসূত্রের সম্পূর্ণ রূপ আমাদের হাতে আসেনি। ইতস্ততঃ উদ্ধৃতি এবং উল্লেখই আমাদের এই ধর্মসূত্র সম্বন্ধে অবহিত করে। ধর্মশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থগুলি, যেগুলি মোটামুটিভাবে তৃতীয় থেকে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে সংকলিত হয়েছিল, অধিকাংশই ধর্মসূত্রের পরবর্তী পদ্যরূপ বলা যায়। এই ধর্মসূত্রগুলি সম্ভবতঃ

খৃষ্টপূর্বাব্দের রচনা এবং প্রাচীন ভারতের রাজনীতিচর্চার সুষ্ঠু পরিচয় বহন করে। বর্তমানে যে সমস্ত ধর্মশাস্ত্রগ্রন্থ আমাদের হাতে এসেছে সেগুলি গৌতম, আপস্তম্ব, বশিষ্ঠ, বোধায়ন, বিষ্ণু, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য এবং নারদের নামের সঙ্গে জড়িত। এই সমস্ত ধর্মশাস্ত্রবিষয়ক স্মৃতি-গ্রন্থে আমরা ব্যক্তিগত, সমাজগত, ও গোষ্ঠীগত জীবনযাত্রায় যে সমস্ত রীতিনীতি ও প্রথা আমাদের মেনে চলা উচিত তার বিশদ বিবরণ পাই। স্বাভাবিকভাবেই কিছু রাজনীতিসংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনা এই সমস্ত গ্রন্থে পাওয়া যায়, যেমন রাজগণের কর্তব্যাকর্তব্য, সাধারণ অর্থনীতি, সামাজিক ও অপরাধমূলক আইন এবং বিচার-সংক্রান্ত নিয়মকানুন। প্রাচীন রাজনীতির ছাত্রদের পক্ষে এই সমস্ত আলোচনার মূল্য অপরিসীম।

পুরাণগ্রন্থগুলির কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। পুরাণগুলি প্রধানতঃ জনগণকে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জগৎসংক্রান্ত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে রচিত হলেও তাদের বর্ণিত বিষয়গুলির পিছনে অনেকক্ষেত্রেই ঐতিহাসিক সত্যতা আছে। বিশেষ করে প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন রাজবংশের যে বিবরণ আমরা এখানে পাই দেশের প্রাচীন ইতিহাস রচনায় তার মূল্য অপরিসীম। অগ্নিপুরাণের নাম এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখনীয় এতে আমরা রাজনীতিসংক্রান্ত বিশদ আলোচনা পাই।

বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের উপর সংকলিত সূত্রগ্রন্থগুলিতে, জাতক গ্রন্থমালায়, মিলিন্দ পহ্ন গ্রন্থে এবং এই দুই সম্প্রদায়ের অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলিতেও সেই সময়কার শাসনসংক্রান্ত কিছু কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা পাওয়া যায়। তবে বইগুলি যেহেতু প্রধানতঃ ধর্মকেন্দ্রিক, সেহেতু রাজনীতিবিষয়ক তথ্য এগুলিতে সামান্যই পাওয়া যায়, কিন্তু সামান্য হলেও এগুলি একেবারে মূল্যহীন নয়।

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের এবং দুর্ভাগ্যেরও বিষয় এই যে প্রকৃত অর্থে ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলতে যা বোঝায় প্রাচীন ভারতে সে ধরণের রচনা সামান্যই হয়েছিল অথবা আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে সে ধরণের রচনা বর্তমানে আমাদের হাতে কমই এসে পৌছেছে। এ বিষয়ে একমাত্র উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ কল্হণের রাজতরঙ্গিণী। কাশ্মীরের রাজবংশের বিবরণ নিয়ে লেখা এই গ্রন্থে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব নেই। দীপবংশ এবং মহাবংশ নামক গ্রন্থদুটিতে ইতিহাসনির্ভর কাহিনীর ভিতরে নির্ভরযোগ্য তথ্য খুব বেশী পাওয়া না গেলেও প্রাচীন ভারতের শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু কিছু বিবরণ সেখানে পাওয়া যায়। ভাস বা কালিদাসের নাট্যরচনায়, বিশেষ করে শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' এবং বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকে, বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' এবং দণ্ডীর 'দশকুমারচরিত' নামক গদ্য-রচনাতেও তৎকালীন শাসনব্যবস্থার কিছু কিছু প্রতিফলন দেখা যায়। 'পঞ্চতন্ত্র', 'বৃহৎকথা' এবং 'কথাসরিৎসাগরে'র মত গল্পগ্রন্থেও অনেক সময় প্রাচীন ভারতীয় শাসনাদর্শের আভাস পাওয়া যায়।

কিন্তু প্রধানতঃ রাজ্যশাসনবিষয়ক নীতি ও ব্যবস্থাকে বিষয়বস্তু করে প্রাচীন ভারতে যে গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল এবং এখনো পর্যন্ত যেটি বাস্তবজ্ঞান ও সূক্ষ্মদর্শিতা গুণের দ্বারা আধুনিক রাজনীতিবিদ্-গণেরও বিস্ময়োদ্রেক করতে পারে সেটি হলো মহামতি কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র। পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদি গ্রন্থে এবং অন্যান্য যে সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থের এ পর্যন্ত উল্লেখ করা হলো সেগুলিতেও রাজনীতিবিষয়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনা পাওয়া যায়, তাই সেগুলি পূর্ণাঙ্গ নয়। কিন্তু কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র সর্বতোভাবেই রাজনীতির গ্রন্থ। রচয়িতা কৌটিল্য, যিনি চাণক্য নামেও প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন, নিজে একজন দক্ষ রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মগধ সিংহাসন অধিকার এবং

মৌর্যবংশ নামে এক নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠার পিছনে চাণক্যের যে বিশেষ সহায়তা ছিল এ বিষয়ে ঐতিহাসিকেরা প্রায় একমত। এই চাণক্য বা কৌটিল্যের রচিত অর্থশাস্ত্র চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যেরই সময়কার প্রচলিত শাসনব্যবস্থার বিবরণ দিচ্ছে অথবা রাজনীতিবিষয়ে সুপণ্ডিত কৌটিল্য রাজনীতিবিষয়ক নিজস্ব মতাদর্শকে এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন, এ বিষয়ে কিছুটা মতভেদ থাকলেও গ্রন্থরচয়িতা যে একজন সুদক্ষ বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ্ ছিলেন সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। বিশেষ করে মহাভারত, পুরাণ বা ধর্মশাস্ত্রাদিতে রাজনীতি সম্বন্ধে আমরা যে আলোচনা পাই তার সঙ্গে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের একটা বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীনতর গ্রন্থগুলিতে রাজনীতির আলোচনা বিশেষ একটা আদর্শমূলক মনোভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। রাজনীতি সেখানে প্রকৃত অর্থেই নীতির দ্বারা শাসিত রাজ্যশাসনবিধি। কৌটিল্যের আলোচনায় একদিকে যেমন রাজনীতিবিষয়ে উচ্চ আদর্শ আছে, তেমনি বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে সময় ও সুবিধামতো নীতিকে বর্জন করে ব্যবস্থাগ্রহণের কথাও সেখানে আছে। যদিও বৃহত্তর জনসমাজের কল্যাণসাধনের দ্বারা রাজার স্বীয় অধিকারে সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা কৌটিল্যের অভিপ্রেত ছিল, তবুও অবস্থাভেদে নীতিবহির্ভূত ব্যবস্থা অবলম্বনেও তাঁর দ্বিধা ছিল না। তাঁর রাজনীতিতে উদ্দেশ্যসিদ্ধিটাই মুখ্য, উপায়টা গৌণ। তাই অবস্থাভেদে উপায়ের হেরফের ঘটাতে তাঁর কোনো আপত্তি ছিল না। এর ফলে তাঁর রাজনীতিতে প্রাচীনদের উচ্চআদর্শ কিছুটা ক্ষুণ্ণ হলেও বাস্তবতারবিচারে কৌটিল্যের স্থান অনেক উঁচুতে।

কৌটিল্যকে কেউ কেউ ইটালীয় পণ্ডিত মেকিয়াভেলির সঙ্গে তুলনা করতে চান। একথা সত্য যে তাঁরা দুজনেই প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং উভয়েই নীতিবোধের উপরে বাস্তব প্রয়োজনকে স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের পরস্পরের মধ্যে এই পর্যন্তই সাদৃশ্য, এর বেশী আর নেই। কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে বুদ্ধিদীপ্ত পর্যালোচনা এবং সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তাঁর ইটালীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর থেকে অনেক বেশী প্রশংসা দাবী করতে পারেন। বিশেষ করে কৌটিল্য ভারতবর্ষের ইতিহাসে একজন প্রখর বুদ্ধিশালী এবং কূটকৌশলী রাজনীতিজ্ঞরূপে পরিচিত, যাঁর প্রভাবে এক বৃহৎ সাম্রাজ্যের উত্থান পতন হতে পারে এবং রাজ্যশাসনবিষয়ে যাঁর অমূল্য উপদেশ বহু বছর পরেও রাজনীতিবিশারদগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। অপরপক্ষে মেকিয়াভেলির খ্যাতি তখনকার মতো আলোড়ন সৃষ্টি করলেও পরবর্তীকালের রাজনীতিতে তার প্রভাব দেখা যায় নি। বরঞ্চ ইউরোপীয় রাজনীতিজ্ঞদের মধ্যে কাউকে যদি কৌটিল্যের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তিনি হলেন বিসমার্ক।

অর্থশাস্ত্র গ্রন্থের ভূমিকাতে বলা হয়েছে যে রাজনীতি বিষয়ক সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থের সারসংকলন করে গ্রন্থটি রচিত হয়েছে এবং এই গ্রন্থে বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনাবসরে উশনস্, বৃহস্পতি, ভরদ্বাজ, পরাশর, বিশালাক্ষ এবং পিশুন প্রভৃতি প্রাচীন আচার্যগণ ও তাঁদের প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের মতামত শ্রদ্ধাপূর্বক উল্লেখ করে খণ্ডন করা হয়েছে। এই সমস্ত আচার্যগণের নাম মহাভারতেও উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু স্মৃতিগ্রন্থকার হিসাবে অন্তের রচনায় তাঁদের যেটুকু পরিচয় পাওয়া যায় তার বাইরে প্রাচীন লেখক হিসাবে তাঁদের কোনো রচনার সন্ধান পাওয়া যায় না। ভবিষ্যতে এঁদের কোনো গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেলে প্রাচীন ভারতের রাজনীতিচর্চা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আরও সম্পূর্ণ হবে আশা করা যায়। বর্তমানে অর্থশাস্ত্র ছাড়া প্রাচীন রাজনীতিবিষয়ক গ্রন্থ যা পাওয়া যায় তাদের

মধ্যে উল্লেখ্য হলো কামন্দকীর নীতিসার, সোমদেব সূরীর নীতিবাক্যামৃতঃ এবং নীতিসার নামে আর একটি গ্রন্থ যেটি শুক্রাচার্য রচনা করেছেন বলে প্রসিদ্ধি। এই গ্রন্থগুলি সবই মোটামুটিভাবে অর্থশাস্ত্র-নির্ভর। কামন্দকীনীতি সম্ভবতঃ তৃতীয় অথবা চতুর্থ শতকের রচনা এবং অর্থশাস্ত্রেরই কিছু কিছু অংশের ছন্দোবদ্ধ প্রতিরূপ বলা যায়। নীতিবাক্যামৃত দশমশতাব্দীর লেখা এবং এটিও অধিকাংশ বিষয়ে কৌটিল্যের অনুসারী। শুক্রনীতিগ্রন্থে কামন্দকীর রচনার অনেক অংশ পাওয়া যায়, কিন্তু প্রাচীন লেখকদের রচনায় পাওয়া যায় না এমন অনেক অংশও এখানে আছে। এটি মোটামুটিভাবে নবম বা দশম শতাব্দীর রচনা হলেও এর অনেক অংশ আরও পরবর্তীকালের। পরবর্তী সময়ের আর কয়েকটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে যেগুলি নিজেরা খুব গুরুত্বপূর্ণ না হলেও ভারতীয়দের রাজনীতিচর্চার ধারাবাহিকতার পরিচয় বহন করে। যেমন, রাজা ভোজের লেখা বলে কথিত যুক্তিকল্পতরু (সম্ভবতঃ ১১শ বা ১২শ শতাব্দী) নীলকণ্ঠের নীতিময়ূখ (১৭শ শতাব্দী) বা বৈশম্পায়নের রচনা বলে কথিত নীতিপ্রকাশিকা।

পূর্বের আলোচনা থেকে এটা এখন সুস্পষ্ট যে দার্শনিক চিন্তাসমৃদ্ধ প্রাচীন ভারতবর্ষ রাজ্যের শাসননীতিসম্বন্ধে চিন্তার ক্ষেত্রেও নিতান্ত অনগ্রসর ছিল না। সাধারণভাবে রাজাই ছিলেন দেশের প্রধান এবং গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি কোথাও কোথাও প্রচলিত থাকলেও রাজতন্ত্র এবং রাজতন্ত্রে রাজার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনাই ছিল রাজনীতিচর্চার কেন্দ্রবিন্দু। সেই কারণেই রাজ্যের এবং রাজার উৎপত্তি বিষয়ে ভারতবর্ষের প্রাচীন প্রজ্ঞাশীল আচার্যগণ বিশেষ গুরুত্বসহকারে আলোচনা করেছেন। রাজ্যের অরাজক অবস্থা চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলারই নিদর্শন এই কথা মনে রেখে মহাভারতকার থেকে আরম্ভ করে মনু-কৌটিল্য প্রভৃতি সকলেই রাজার উৎপত্তির বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। সাধারণতঃ ক্ষত্রিয়েরাই রাজ্যশাসনের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হতেন এবং যদিও কিছু কিছু নির্বাচিত রাজার বৃত্তান্ত পাওয়া যায় তাহলেও রাজপদ সাধারণভাবে বংশানুক্রমিক ছিল বলেই মনে হয়। রাজপরিবারের প্রতি প্রজাদের আনুগত্য সৃষ্টির জন্য প্রাচীন আচার্যেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজার দৈব উৎপত্তির কথা বলেছেন। অথর্ববেদে (৩/৩ ; ৩/৪ ; ৪/২২) এবং শতপথ ব্রাহ্মণে (৫. ১. ৫. ১৪) এই মতবাদের আভাস আছে। পরবর্তীকালে মহাভারতে (শান্তিপর্ব, ৪০-৪১) এবং মনুসংহিতায় (৭।৩-৪) এই মতবাদকে সুস্পষ্ট ভাষায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। মহাভারতে বলা হয়েছে—"মনুষ্যজ্ঞানে রাজাকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়, কারণ রাজা হচ্ছেন নররূপে দেবতা। বিভিন্ন পরিস্থিতি অনুযায়ী তিনি অগ্নি, আদিত্য, মৃত্যু, বৈশ্রবণ এবং যম এই পাঁচরকম দেবতার রূপ গ্রহণ করতে পারেন।" সেখানে আরও বলা হয়েছে, "দৈব উৎপত্তির জন্যই অসংখ্য লোক তাঁর শাসনব্যবস্থা মেনে চলে, যদিও তিনি একই পৃথিবীর মানুষ এবং একই প্রকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অধিকারী।" মনুসংহিতাতেও একই কথা—"অরাজক অবস্থায় যখন প্রাণিবর্গ প্রাণভয়ে বিচলিত ছিল তখন বিধাতা জগতের রক্ষার জন্য ইন্দ্র, অনিল, যম, অর্ক, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র এবং কুবেরের অংশ গ্রহণ করে রাজাকে সৃষ্টি করেছিলেন।" তবে আশ্চর্যের বিষয় কৌটিল্য তাঁর স্বচ্ছ বাস্তবদৃষ্টি নিয়ে রাজার দৈব উৎপত্তি স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে জনসাধারণের জীবন সম্পত্তি রক্ষার জন্য একজন রক্ষকের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল এবং এর থেকেই রাজপদের উৎপত্তি হয়েছিল।

কিন্তু কৌটিল্যকে বাদ দিলে প্রাচীন ভারতের অধিকাংশ আচার্যই যে রাজার মর্যাদা এবং ক্ষমতা নির্দ্দেশ করতে গিয়ে তাঁর উপর কিছুটা দেবত্ব আরোপ করে ফেলেছিলেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে যথোচিত রাজকর্ত্তব্যপালনকারী রাজাকেই একমাত্র এই মর্যাদা দেওয়া হত। রাজা দেবতা নন, তিনি নরদেবতা। শুক্রনীতিগ্রন্থে বলা হয়েছে যে অধার্মিক রাজা রাক্ষসতুল্য। সুতরাং ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে রাজা দেবতা বটে, কিন্তু এই দেবত্ব তাঁকে অর্জন করতে হয় সুকঠিন কর্ত্তব্যপালনের মধ্য দিয়ে। দেবত্বের অধিকার নিয়ে কর্ত্তব্যচ্যুত রাজাকে ভারতবর্ষ কখনো মেনে নেয় নি। এদেশে রাজপদ শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে একটি বিশিষ্ট অঙ্গমাত্রই, তার বেশী কিছু নয়। এদেশে রাজতন্ত্র কখনোই রাজাকে স্বেচ্ছাচারী হবার অধিকার দেয় নি। যদি কোনো রাজা নিজে সেই অধিকার পেতে চাইতেন তাহলে তার প্রতিফলও তাঁকে পেতে হতো, ইতিহাস-পুরাণ তার সাক্ষ্য দেবে। আত্মকল্যাণের জন্যই মানুষ সমাজ গঠন করে আর সমাজের মানুষের যৌথস্বার্থরক্ষার ভার দেওয়া হয় রাজাকে। সুতরাং সমাজের বৃহত্তর জনগণের কল্যাণসাধনই রাজার প্রধান কর্ত্তব্য। এ ব্যাপারে ভারতীয় আচার্যগণের কোনো মতদ্বৈধ নেই। এমন কি সর্বপ্রাচীন ধর্মগ্রন্থ, ঋগ্বেদেও রাজাকে জনগণের রক্ষক ('গোপা অদাভ্যোভব'— ১০ | ২৫ | ৭) বলা হয়েছে। মহাভারতকার বলেছেন—নাগরিকদের রক্ষা এবং রাজ্যের মঙ্গলসাধন—রাজার এই দুটি কর্ত্তব্য) (শান্তিপর্ব ৫৯ | ৭০) সুতরাং প্রাচীন ভারতের শাসনব্যবস্থা আপাতদৃষ্টিতে রাজতন্ত্রমূলক হলেও প্রকৃতপক্ষে শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক কিছুটা পারস্পরিক বোঝাপড়ার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সর্বতোভাবে রাজাদেশের অনুবর্ত্তী থাকা যেমন প্রজাদের কর্ত্তব্য ছিল, তেমনি প্রজাদের মঙ্গল সম্পাদন করাই রাজার মুখ্য কর্ত্তব্য বলে পরিগণিত হতো। রাজার দৈব উৎপত্তির কথা বললেও প্রাচীন আচার্যগণ রাজাকে রাজ্যনামক প্রতিষ্ঠানের একজন মুখ্য সেবক বলেই জানতেন। বোধায়ন বলেছেন—রাজা প্রজাগণকে রক্ষা করবেন, পরিবর্ত্তে তাদের উপার্জনের এক ষষ্ঠাংশ তাঁর প্রাপ্য। চাণক্যও অনুরূপ মতপোষণ করেন—রাজা যেহেতু প্রজাদের নিকট থেকে বেতন গ্রহণ করেন অতএব রাজ্যের স্বার্থরক্ষা করা তাঁর কর্ত্তব্য। কিছুটা পরবর্ত্তীকালের গ্রন্থ শুক্রনীতিতে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক রাজার উৎপত্তির কথা বলা হলেও রাজাকে প্রজাগণের সেবক বলেই বলা হয়েছে। সুতরাং প্রাচীন ভারতীয় রাজতন্ত্র যে এই মৌলনীতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। রাজা তাঁর কর্ত্তব্যপালনে অপারগ হলে প্রজাদের দিক থেকেও বিশ্বস্ত থাকার কোনো ব্যাপার থাকতো না। এমনকি অপদার্থ রাজাকে সরিয়ে দিয়ে দেশের শাসনভার অন্যের উপর অর্পণ করার মতো আধুনিক চিন্তারও পরিচয় আমরা মহাভারতে এবং মনুসংহিতাতে পাই। শুক্রনীতি গ্রন্থেও বলা হয়েছে যে রাজা ধর্মবিরোধী আচরণ করলে জনগণ তাঁকে রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত করতে পারেন এবং জনগণের সম্মতি অনুসারে রাজপুরোহিত রাজবংশেরই অন্য কাউকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করতে পারেন। অতএব প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ অনুযায়ী রাজক্ষমতা কখনোই স্বতন্ত্র বা স্বেচ্ছাচারী হতে পারতো না, তা ছিল সীমাবদ্ধ। রাজাকে শাস্ত্রের নির্দ্দেশ মেনে এবং ত্রিবেদজ্ঞ ও দণ্ডনীতিতে অভিজ্ঞ আচার্যগণের উপদেশ অনুযায়ী রাজ্যশাসনের ব্যবস্থা করতে হত।

ভারততত্ত্বভাস্কর রমেশচন্দ্র মজুমদার

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত ফরিদপুর জেলার খান্দারপাড়া গ্রামে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর এক সম্ভ্রান্ত বৈদ্য পরিবারে রমেশচন্দ্রের জন্ম হয়। রমেশচন্দ্রের পিতা হলধর মজুমদার আগরতলায় ত্রিপুরার মহারাজার এস্টেটের উকীল ছিলেন। রমেশচন্দ্রের মাতামহ প্রসন্নকুমার সেন পূর্ববঙ্গের অতিপ্রসিদ্ধ মহারাজা রাজবল্লভের ষষ্ঠ অধস্তন পুরুষ ছিলেন। রমেশচন্দ্রের মাতা তাঁহার একমাত্র সন্তান ছিলেন। রমেশচন্দ্রের শৈশবকালেই তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। গ্রাম্য বিদ্যালয়, কলিকাতার সাউথ সুবার্বন স্কুল, ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল, হুগলী কলেজিয়েট স্কুল, কলিকাতার হিন্দু স্কুল প্রভৃতি বিদ্যালয়ে কিছু কিছু কাল অধ্যয়ন করিয়া অবশেষে রমেশচন্দ্র কটকের র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন ও এই স্কুল হইতে ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি এণ্টান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য তিনি একটি বৃত্তিও লাভ করেন। রমেশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রকাশচন্দ্র মজুমদার প্রথম জীবনে সরকারী স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তিনিই পরিবারের অভিভাবক। তাঁহার কর্মস্থল পরিবর্ত্তনের ফলে রমেশচন্দ্র ও তাঁহার মেজদাদা সতীশচন্দ্রকে ঘন ঘন বিদ্যালয় পরিবর্তন করিতে হইত। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে রমেশচন্দ্র কলিকাতার রিপন কলেজ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষায় তিনি চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে রমেশচন্দ্র ইতিহাস (অনার্স) সহ প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকত্ব লাভ করেন। স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে অধ্যয়নের জন্য তিনি একটি বিশেষ বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্ররূপে ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে রমেশচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের এম-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন। ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে রমেশচন্দ্র খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দ হইতে খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দ পর্যন্ত অনধ্র কুষাণ যুগ সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। রমেশচন্দ্রের এই গবেষণা পত্রের (থিসিস) পরীক্ষক ছিলেন স্বনামধন্য জার্মান সংস্কৃতজ্ঞ ডঃ থিবো। ডঃ থিবো এই গবেষণার ভূয়সী প্রশংসা করেন। ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে রমেশচন্দ্র ঢাকা ট্রেনিং কলেজে একটি অধ্যাপক পদ পাইয়া ঢাকায় কার্যে যোগদান করেন। কিছুদিন এই পদে কার্য করার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন কর্মধার স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আহ্বান পাইয়া তিনি সরকারী চাকুরী ত্যাগ করেন এবং ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে লেকচারার রূপে অধ্যাপনার কাজে যোগদান করেন। ১৯১৪ হইতে ১৯২: খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রমেশচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। এই সাত বৎসরের মধ্যেই তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের ভিত্তি রচিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রমেশচন্দ্রকে প্রথমে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের সঙ্গে আধুনিক ভারতের ইতিহাসও পড়াইতে হইত। কিছুদিন পর আশুতোষ রমেশচন্দ্রকে একান্তভাবে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস বিষয়ে গবেষণা করিতে অনুপ্রাণিত করেন। তাঁহার নিকট তিনি এই ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে ভবিষ্যতে

তাঁহাকে শুধু প্রাচীন ভারত বিষয়েই পড়াইতে হইবে। প্রাচীন ভারত বিষয়ে রমেশচন্দ্র যেন অল্প দিনের মধ্যে একটি গ্রন্থ রচনা করেন—সার আশুতোষ এই ইচ্ছাও প্রকাশ করেন। চীনা ভাষায় প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের অনেক উপকরণ আছে এই তথ্য অবগত হইয়া আশুতোষ রমেশচন্দ্রকে চীন দেশে চীনা ভাষায় শিক্ষা করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। পরিবারবর্গের আপত্তির কারণে রমেশচন্দ্র আশুতোষের এই ইচ্ছা পূরণ করিতে পারেন নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করার পর হইতে সার আশুতোষের অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া রমেশচন্দ্র প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস সংশ্লিষ্ট অনেকগুলি প্রবন্ধ রচনা করেন। এই প্রবন্ধগুলি লণ্ডনের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটি, বিহার ও ওরিশা রিসার্চ সোসাইটির মুখপত্র বা জার্ণালে এবং ইণ্ডিয়ান হিস্টোরিক্যাল কোয়ার্টালি, জার্ণাল অব ইণ্ডিয়ান 'হিষ্ট্রী' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রাচীন ভারত বিষয়ক একটি গবেষণাপত্রের জন্য রমেশচন্দ্র এই সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্রিফিথ পুরস্কার লাভ করেন। এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু কিছু পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করিয়া তিনি প্রাচীন ভারতের সংঘজীবন বিষয়ে একটি গবেষণা গ্রন্থ রচনা করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ-ডি উপাধি লাভ করেন (১)।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র নব প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক পদ লাভ করিয়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। সার আশুতোষের স্নেহছায়ায় ঐতিহাসিকরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া রমেশচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া ঢাকায় যাইতে ইচ্ছুক ছিলেন না, কিন্তু আর্থিক কারণে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অপরের অধীনে লেক্চারার রূপে তিনি মাত্র চারিশত টাকা বেতন পাইতেন, ঢাকার অধ্যাপক রূপে তাঁহার এক সহস্র মুদ্রা প্রারম্ভিক বেতন ছিল। সার আশুতোষ রমেশচন্দ্রের এই উন্নতিতে বাধা দেওয়া দূরে থাকুক তিনি যাহাতে এই পদ লাভ করেন স্বয়ং তাহার চেষ্টা করেন এবং এই চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয়। আশুতোষ তাঁহাকে বলেন যে—মাথা উঁচু করে কাজ করবে, ভয় করবে না কখনও নতি স্বীকার করবে না। তোমায় এই আশ্বাস দিচ্ছি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা তোমার জন্য চিরদিনই খোলা থাকবে। ওখানে যদি কোন কারণে তোমার থাকা সম্ভব না হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তোমার ঠাঁই হবে—এটা সর্বদা মনে রাখবে" (জীবনের স্মৃতি দীপে—পৃঃ ৪৬)।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে রমেশচন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা কাল হইতেই রমেশচন্দ্রের ন্যায় কলিকাতার বহু অধ্যাপক উচ্চ বেতনে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ইহাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মহম্মদ শহীদুল্লাহ্, হরিদাস ভট্টাচার্য, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ সুরু হওয়ার পর প্রত্যেক ফ্যাকালটির জন্য একজন ডীন্ নির্বাচিত হন। তরুণ রমেশচন্দ্র, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে ভোটে পরাজিত করিয়া 'আর্টস্' কলা বিভাগের ডীন্ নির্বাচিত হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য ডঃ ফিলিপ হার্টগ বিশ্ববিদ্যালয়টিকে একটি গবেষণাকেন্দ্র রূপে সংগঠন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। তাঁহার উৎসাহে রমেশচন্দ্র এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে প্রাচীন ভারত বিষয়ে বহু গ্রন্থ ক্রয়ের ব্যবস্থা করেন। হার্টগের উৎসাহে ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে রমেশচন্দ্র 'আলি

হিষ্ট্রী অফ্ বেঙ্গল' নামে প্রাচীন বাংলার একটি সংক্ষিপ্ত অথচ প্রামাণিক ইতিহাস রচনা করিয়া প্রকাশ করেন (২)। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার রচিত 'আউট লাইন অব এনসিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্রী য়্যাণ্ড সিভিলিজেসন' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় (৩)। এই বহুখানি পরবর্তীকালে, পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত আকারে 'এনসিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া' নামে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটি বহুবার পুনর্মুদ্রিত হয় (৪)। প্রাচীন ভারত ইতিহাসের অনিসন্ধিৎসু ছাত্র ও গবেষকরূপে রমেশচন্দ্রের মনে এই চিন্তার উদয় হয় যে প্রাচীনকালে ভারতীয়েরা ভারতের বাহিরে মালয়, শ্যাম, কম্বোডিয়া, আনাম, জাভা, সুমাত্রা, বলিদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া ঐ সব দেশে ভারতীয় সভ্যতার বিস্তারসাধন করেন। এই বিষয়ে ভারতীয় ঐতিহাসিকদেরও মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। দ্বীপময় ভারতে ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে ফরাসী ও ডাচ্ পণ্ডিতেরা ইতিপূর্বে গবেষণা করিয়া বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন কিন্তু ওই গবেষণা গ্রন্থগুলি সবই ডাচ্ অথবা ফরাসী ভাষায় লিখিত। এই সব গ্রন্থ অধ্যয়ন ও পুনর্মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে রমেশচন্দ্র ঢাকায় বসিয়া ডাচ ও ফরাসী ভাষা মোটামুটি ভাবে শিক্ষা করেন। পরে অভিধানের সাহায্যে এই দুই ভাষায় লিখিত আকর গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার মন তৃপ্ত হয় নাই। তাঁহার মনে হয় ডাচ্ ও ফরাসী ভাষা শিক্ষা করিতে হইলে, তাঁহাকে ফ্রান্স ও নেদারল্যাণ্ডস্ যাইতে হইবে, সেই সঙ্গে এই দুই দেশে রক্ষিত দ্বীপময় ভারতের পুরাকীর্তি নিদর্শনগুলি পর্যবেক্ষণ ও অনুশীলন করিয়া দ্বীপময় ভারতেও যাইতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নিকট এই অভিপ্রায় প্রকাশ করায় বিদ্যুৎসাহী ইংরাজ উপাচার্য রমেশচন্দ্রকে সবেতন দশ মাসের ছুটি মঞ্জুর করেন। বিদেশ হইতে এতৎসংক্রান্ত পুস্তকাদি ক্রয়ের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী তহবিল হইতে রমেশচন্দ্রকে ত্রিশ হাজার টাকা দেওয়ার ব্যবস্থাও তিনি করিয়া দেন। ডাচ্ ও ফরাসী ভাষা আয়ত্ত করিয়া তিনি হিন্দু উপনিবেশের ইতিহাসের প্রথম খণ্ড রূপে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজী ভাষায় চম্পা (বর্তমান ভিয়েতনাম) নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন (৫)। এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে ইতিহাস, সমাজ, ধর্ম প্রভৃতির আলোচনা এবং দ্বিতীয় ভাগে ঐ দেশে প্রাপ্ত সংস্কৃত লেখমালার ইংরেজী অনুবাদ সন্নিবিষ্ট ছিল। গুণগ্রাহী ইংরাজ শিক্ষাবিদ্ ডঃ হার্টগ এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া এ বিষয়ে উচ্চতর গবেষণার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং এই জন্যই রমেশচন্দ্রের বিদেশ যাওয়ায় আনুকূল্য করেন।

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলে রমেশচন্দ্র বিদেশ যাত্রা করেন। লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে কয়েক মাস পড়াশুনা করিয়া তিনি হল্যাণ্ড বা নেদারল্যাণ্ডসে আসেন। ঐ সময় পর্যন্ত জাভা, সুমাত্রা বলি প্রভৃতি দেশগুলি (বর্তমান ইন্দোনেশিয়া) হলাণ্ডসেবাসী ডাচ্ জাতির অধীন ছিল। ডাচ্ পণ্ডিতেরা এই অঞ্চলের প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে বহু অনুসন্ধান ও গবেষণা করেন। এই অঞ্চলের বহু প্রত্ন নিদর্শন হলাণ্ডের মিউজিয়ামগুলিতে রক্ষিত ছিল। হলাণ্ডের শহরে প্রাচ্য বিদ্যা-বিশারদ ডাচ্ পণ্ডিত হেণ্ডরিক কার্ণের (১৮৩৩-১৯১৭) স্মৃতিরক্ষার্থ কার্ণ ইন্‌স্টিটিউট নামে একটি প্রাচ্য-বিদ্যা-গবেষণাকেন্দ্র ছিল। রমেশচন্দ্র যখন হলাণ্ডে আসেন তখন ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগের অবসর প্রাপ্ত অধিকর্তা ডাচ্ পণ্ডিত ভোগেল লাইডেনে কার্ণ ইন্‌স্টিটিউটের একজন কর্মকর্তা ছিলেন। ভোগেলের সহিত রমেশচন্দ্রের পরিচয় ছিল। ভোগেল রমেশচন্দ্রের লাইডেনে বাসের ও কার্ণ ইন্‌স্টিটিউটে অধ্যয়ন ও গবেষণার সুব্যবস্থা করিয়া দেন। কয়েক মাস লাইডেনে অতিবাহিত করিয়া রমেশচন্দ্র কিছুদিন লণ্ডনে

বাস করেন ও পরে প্যারিসে আসেন। প্যারিসে কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়া রমেশচন্দ্র ইতালি, জার্মানী, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশ পরিদর্শন করেন। পরে দ্বিতীয়বার হলাণ্ডে আসেন এবং এখান হইতে জলপথে পূর্ব পরিকল্পনা মত যবদ্বীপ বা জাভায় আসেন। যবদ্বীপে কিছুকাল থাকিয়া তিনি বলিদ্বীপে যান। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে একমাত্র বলিদ্বীপেই এখনও হিন্দুধর্ম প্রচলিত আছে। বলিদ্বীপ হইতে জাভায় প্রত্যাবর্তন করিয়া রমেশচন্দ্র সেখান হইতে প্রথমে আনামে আসেন। আনামের প্রাচীন নাম চম্পা (বর্তমানে এই দেশ ভিয়েনাম নামে পরিচিত), আনাম হইতে রমেশচন্দ্র পার্শ্ববর্তী রাজ্য কম্বোডিয়ায় যান (বর্তমান কাম্পুচিয়া) এই দেশ দেখিয়া রমেশচন্দ্র শ্যামদেশে আসেন (থাইল্যাণ্ড)। কম্বোডিয়া হইতে মালয় উপদ্বীপ হইয়া রমেশচন্দ্র সিঙ্গাপুরে আসেন। ইহার পূর্ব নাম ছিল সিংহপুর, যবদ্বীপ হইতে পলাতক এক হিন্দুরাজা এই রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। সিঙ্গাপুর হইতে রমেশচন্দ্র রেঙ্গুন হইয়া প্রায় ন মাস পর ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। দ্বীপময় ভারতের প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনগুলি দেখিয়া আসিয়া রমেশচন্দ্র প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশগুলি সম্বন্ধে গবেষণামূলক অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। তবে নানা কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য তাঁহার গবেষণা গ্রন্থগুলি একে একে দীর্ঘকাল ধরিয়া ধীরে ধীরে প্রকাশ করিতে হইয়াছিল। ইংরেজীতে লিখিত এই পুস্তকগুলির নাম—এনশিয়াণ্ট ইণ্ডিয়ান কলোনীজ ইন্ দি ফার ঈষ্ট (প্রথম খণ্ড চম্পা) দ্বিতীয় খণ্ড (সুবর্ণ দ্বীপ), এনশিয়াণ্ট ইণ্ডিয়ান কলোনিজেসন ইন সাউথ ঈষ্ট এসিয়া, হিন্দু কলোনীজ ইন দি ফার ঈষ্ট, ইন্সক্রিপশনস অব কম্বোজ, (কম্বুজদেশ অংয়গন) এনশিয়ণ্ট হিন্দু কলোনী ইন কাম্পোডিয়া, গ্রেটার ইণ্ডিয়া ইত্যাদি (৬-১১)। এতদ্ব্যতীত এই বিষয়ে তিনি ইংরেজী বাংলা সাময়িক পত্রেও বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র প্রাচীন বাংলার ইতিহাস বিষয়ে ইংরাজীতে একটি পুস্তক রচনা করেন—ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই পুস্তক প্রকাশের পর প্রাচীন বাংলা সম্বন্ধে নানা নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হওয়ায় রমেশচন্দ্রের মনে বাংলার একটি পূর্ণাঙ্গ প্রামাণিক ইতিহাস রচনার সঙ্কল্প উদিত হয়। ইতিহাসাচার্য সার যদুনাথ সরকারকে রমেশচন্দ্র গুরুর মত মান্য করিতেন। এবিষয়ে তাঁহার নিকট রমেশচন্দ্র নিজ মনোভাব ব্যক্ত করেন। যদুনাথ রমেশচন্দ্রকে এবিষয়ে উৎসাহিত করেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কার্যোপলক্ষ্যে ঢাকায় আসিয়া একটি ভাষণে তিনি এইরূপ একখানি ইতিহাস সঙ্কলনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন এবং প্রয়োজন হইলে নিজে এই ব্যাপারে যথাসাধ্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দান করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে রমেশচন্দ্রের অপর এক সহযোগী ছিলেন। ঐতিহাসিক এ. ফজলুর রহমান। বাংলার ইতিহাস রচনার প্রস্তাবে তিনিও বিশেষ উৎসাহিত ছিলেন। ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন। রমেশচন্দ্র প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশের ইতিহাস রচনার কাজ আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া বাংলার ইতিহাস রচনায় অধিক সময় দিবেন এই আশ্বাস পাইয়া ভাইস-চ্যান্সেলার রহমান সাহেব বাংলার ইতিহাস রচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন—রমেশচন্দ্রকে এই কমিটির সভাপতি করা হয়। রমেশচন্দ্র তাঁহার দুই সহকর্মী ডঃ কালিকারঞ্জন কানুনগো, সুধীভ্রনাথ ভট্টাচার্য ও ঢাকা মিউজিয়মের অধ্যক্ষ ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালীর সহায়তায় একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন ও এই পরিকল্পনা বিশ্ববিদ্যালয়

কর্তৃক গৃহীত হয়। প্রথমখণ্ডে হিন্দু যুগ, দ্বিতীয় খণ্ডে মুঘল যুগের পূর্ব পর্যন্ত ও তৃতীয় খণ্ডে মুঘল যুগ (১৫৭৬-১৭৫৭) এর ইতিহাস রচনার পরিকল্পনা করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাবিত গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যয়ভার বহন করিতে সম্মত হন। এই পরিকল্পনাটি প্রচারিত হইলে বঙ্গীয় সরকার ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রত্যেকে পুস্তক প্রকাশ তহবিলে এক হাজার টাকা দান করেন। বাংলা ইতিহাসের প্রথম খণ্ডটির (হিন্দু যুগ, অর্থাৎ প্রাচীন বাংলা) সম্পাদন ভার রমেশচন্দ্রের উপর ন্যস্ত হওয়ার পর রমেশচন্দ্রও এ বিষয়ে তাঁহার সর্বশক্তি প্রয়োগ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার মিঃ রহমান বঙ্গীয় সরকারের পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হওয়ায় ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১ জুন রমেশচন্দ্র ৫ বৎসরের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর বা উপাচার্য নিযুক্ত হন। এই পাঁচ বৎসরকালে রমেশচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। তাঁহার সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি কৃষিশিক্ষা বিভাগ (ডিপার্টমেণ্ট অফ এগ্রিকালচার) সৃষ্ট হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, বিজ্ঞানাগার (ল্যাবরেটরী) ও পুঁথিশালা প্রভৃতি সমৃদ্ধতর হয়, গবেষণা বিষয়েরও উন্নতি হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়া একটি পরিকল্পনাও প্রস্তুত হয়। এই উদ্দেশ্যে রমেশচন্দ্র জগমোহন পাল নামক এক ধনী ভদ্রলোকের নিকট হইতে পাঁচ লক্ষ টাকা দান সংগ্রহ করেন। দুঃখের বিষয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালে এই মেডিকেল কলেজ স্থাপনের কাজটি স্থগিত রাখা হয়। পরবর্তীকালে রমেশচন্দ্র পরিকল্পিত এই মেডিকেল কলেজটি স্থাপিত হইয়াছিল। রমেশচন্দ্রের ভাইস-চ্যান্সেলার রূপে কার্যকালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হায়দ্রাবাদের প্রধান মন্ত্রী সার আকবর হায়দারী, দেশনেত্রী ও কবি সরোজিনী নাইডু, সাংবাদিক ও জাতীয়তাবাদী নৈয়দ হোসেন (পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারতের ইরাণে রাষ্ট্রদূত) প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি রমেশচন্দ্রের আতিথ্য গ্রহণ করেন।

রমেশচন্দ্রের ভাইস-চ্যান্সেলার রূপে কার্যকালে ঢাকায় কয়েকবারই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা আত্ম-প্রকাশ করে, সেই সময় হিন্দু-মহাসভার সভাপতিরূপে শ্যামাপ্রসাদ ঢাকায় আসেন ও রমেশচন্দ্রের অতিথি হন। ঢাকার স্থানীয় কর্তৃপক্ষ শ্যামাপ্রসাদের আগমন পছন্দ করেন নাই, রমেশচন্দ্রকেও তাঁহারা এ বিষয়ে সতর্ক করিয়া দেন। কর্তৃপক্ষের অমতে রমেশচন্দ্র শ্যামাপ্রসাদকে নিজ বাড়ীতে রাখেন। কর্তৃপক্ষকে শ্যামাপ্রসাদের জীবনরক্ষার জন্য অগত্যা রমেশচন্দ্রের বাড়ীতে পুলিশ রক্ষীর ব্যবস্থা করিতে হয়। শ্যামাপ্রসাদ দাঙ্গায় দুর্গত হিন্দুদের মধ্যে সাহস সঞ্চার করেন। ঢাকার নবাব ও অন্যান্য মুসলমান নেতৃবৃন্দের সহিত আলাপ আলোচনা ও একত্রে দুর্গত অঞ্চল পরিদর্শন করায় অতঃপর দাঙ্গা প্রশমিত হয়। অনুরূপ ভাবে রমেশচন্দ্র নিজ জীবনের বিপদ উপেক্ষা করিয়া ঢাকার নবাবের সহিত কয়েকবার দাঙ্গা-দুর্গত হিন্দু-মুসলমান মহল্লা পরিদর্শন করিয়াছিলেন। সাম্প্রদায়িক বিরোধের জন্য কুখ্যাত ঢাকায় অবস্থিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে রমেশচন্দ্রের পরিচালন দক্ষতায় কোন সময়েই সাম্প্রদায়িকতা প্রবেশ করিতে পারে নাই। হিন্দু-মুসলমান শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার কারণে সম্প্রীতির বাতাবরণ নষ্ট হইতে পারে নাই। রমেশচন্দ্র ঢাকার মুসলমান নেতৃবৃন্দেরও শ্রদ্ধা ও আস্থাভাজন ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস-চ্যান্সেলার রূপে কার্যকালে প্রথমে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার বা আচার্য ছিলেন যথাক্রমে সার জন এণ্ডারসন ও সার জন

উড্‌হেড্‌। বিভিন্ন সময়ে এই দুই ইংরাজ গভর্ণর বিভিন্ন ব্যাপারে রমেন্দ্রচন্দ্রকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। স্বাধীনচিত্ত রমেশচন্দ্র প্রয়োজন স্থলে ইঁহাদের মতের বা ইচ্ছার প্রতিবাদ করিতে ভীত হইতেন না। এই দুই দক্ষ ইংরাজ গভর্ণর বহুক্ষেত্রেই রমেশচন্দ্রের যুক্তি খণ্ডন করিতে না পারিয়া শেষ পর্যন্ত রমেশচন্দ্রকে নিজের বুদ্ধি বিবেচনা মত কাজ করার স্বাধীনতা দিতেন।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগ হইতেই পূর্ববঙ্গের ঢাকা জেলা ও ঢাকা শহর বঙ্গদেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল, স্বাভাবিকভাবেই ছাত্রসমাজও এই রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাবমুক্ত ছিল না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলিতে রাজনীতি এমন কি সহিংস পন্থায় বিশ্বাসী ছাত্রদের অভাব ছিল না। এই জন্য অনেক সময় যখন তখন ছাত্রাবাসে হানা দিয়া পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ সন্দেহভাজনদের গ্রেপ্তার করিয়া যাইত। ঢাকায় জগন্নাথ হলের প্রোভাস্ট (ছাত্রাধ্যক্ষ) ও প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলার রূপে রমেশচন্দ্র ঢাকা বিভাগের বিভাগীয় কমিশনারের সহিত বহু বাদানুবাদের পর এই ব্যবস্থা করেন যে ছাত্রাবাসের অধ্যক্ষের অনুমতি না লইয়া পুলিশ ছাত্রাবাস 'সার্চ' করিতে বা কোন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবে না। 'সার্চ' করার প্রয়োজন হইলে ছাত্রাধ্যক্ষ বা কোন শিক্ষকের বিনা উপস্থিতিতে 'সার্চ' করা চলিবে না। কোন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করিয়া তাহাকে হাঁটাইয়া থানায় লইয়া যাওয়া হইবে না, গাড়ী করিয়া লইয়া যাইতে হইবে। রমেশচন্দ্রের এই দাবিগুলি বিভাগীয় কমিশনার ও পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষকে মানিয়া লইতে হয়। রমেশচন্দ্রের অনুরোধে বিভাগীয় কমিশনার তাঁহাকে পুলিশের অনুমতিতে ছাড়াই যে কোন সময়ে জেলেবন্ধ তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন ছাত্রের সহিত সাক্ষাতেরও অনুমতি দেন। রমেশচন্দ্র প্রায়ই বন্দী ছাত্রদের খোঁজখবর লইতে জেলে যাইতেন। বন্দী ছাত্রদের মধ্যে বহু মেধাবী ছাত্র ছিল, রমেশচন্দ্র জেলের মধ্যে ইহাদের অনেকের পড়াশুনার সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিলেন, জেলে থাকিয়াই ইহারা পড়াশুনা করিয়া পরীক্ষায় বসিত। ছাত্র-জীবনে রমেশচন্দ্র বিপ্লবে বিশ্বাসী কিছু ছাত্রের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁহাদের দ্বারা প্রভাবিত হন। বিপ্লবী বন্ধুদের প্রতি রমেশচন্দ্রের সহানুভূতি ছিল কিন্তু তাঁহাদের সহিত তিনি ইচ্ছাসত্ত্বেও যোগদান করিতে পারেন নাই। বহু আত্মীয়-স্বজন সমন্বিত একটি বিরাট পরিবার তাঁহার জ্যেষ্ঠাগ্রজ প্রকাশচন্দ্রের উপার্জনের উপর নির্ভরশীল ছিল। ভালভাবে বিদ্যার্জন করিয়া সংসারের দারিদ্র্য দূর করা ও জ্যেষ্ঠাগ্রজের ভার লাঘব করিতে তিনি কৃতসঙ্কল্প ছিলেন। বিপ্লবকার্যে যোগদান তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে না একথা দুঃখের সহিত তিনি তাঁহার বিপ্লবী বন্ধুদের জানাইয়া দিয়াছিলেন। স্বদেশী আন্দোলন এবং সেই সঙ্গে তখনকার বিপ্লবীদের নিঃস্বার্থ আত্মদান রমেশচন্দ্রকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। ঢাকায় অবস্থান কালে অভয়াশ্রমের কর্মী এবং স্থানীয় কোন কোন বিপ্লবীকে রমেশচন্দ্র অর্থ সাহায্য দান করিতেন। প্রয়োজনের সময় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার সহকর্মী বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের সহযোগিতায় অন্যান্য অন্তরঙ্গ বন্ধুদের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতেন। অর্থ সংগ্রহকালে বন্ধুদের নিকট তাঁহারা বলিতেন যে সৎকার্যেই এই অর্থ ব্যয় হইবে। আর কিছু তাঁহারা যেন জিজ্ঞাসা না করেন। বন্ধুগণের নিকট এই ইঙ্গিত পর্যাপ্ত বোধ হইত। রমেশচন্দ্র যখন কটকের স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন, তখন কিশোর বয়স্ক সুভাষচন্দ্রও কটকে ছিলেন, কটক তাঁহার পিতার কর্মস্থল ছিল। রমেশচন্দ্রের এক ভাগিনেয় কটকে কিশোর সুভাষের সহপাঠি ছিল, সেই সূত্রে সুভাষ

রমেশচন্দ্রকে 'মামা' বলিতেন। পরবর্তীকালে সুভাষচন্দ্রের সহিত রমেশচন্দ্রের সম্পর্ক গাঢ়তর হয়। রমেশচন্দ্রের কলিকাতায় থাকার সময় সুভাষচন্দ্র মধ্যে মধ্যে রমেশচন্দ্রের নিকট অর্থ চাহিতেন। এই অর্থ যে সুভাষ দেশের কাজের জন্যই চাহিতেন ইহা রমেশচন্দ্র ভাল রূপেই বুঝিতেন, সেই জন্য তিনি তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে কোন আপত্তি করিতেন না। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের বড়দিনের ছুটিতে রমেশচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়াছেন জানিতে পারিয়া সুভাষচন্দ্র লোক পাঠাইয়া রমেশচন্দ্রকে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অনুরোধ করেন। সুভাষচন্দ্র তখন জেলের কয়েদী, শারীরিক অসুস্থতার জন্য সরকার তাঁহাকে এলগিন রোডে নিজের বাড়ীতেই থাকার অনুমতি দিয়াছিলেন। নির্দিষ্ট দিনে রমেশচন্দ্র সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে এলগিন রোডের বাড়ীতে দেখা করেন। বাড়ীর দোতলায় উঠার পর একজন তাঁহাকে দরজা খুলিয়া নির্দেশ দেয় যে কয়েকটি ঘর পার হইয়া একটি বিশেষ নিভৃত কক্ষে সুভাষের দেখা মিলিবে, সে-ঘরে সকলের যাওয়ার অধিকার নাই। কুশল প্রশ্ন বিনিময়ের পর সুভাষ রমেশচন্দ্রের নিকট কিছু অর্থ প্রার্থনা করেন এবং বলেন যে এই বিশেষ কারণেই তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে। রমেশচন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে টাকায় তাঁহার কি প্রয়োজন? তিনি বলিলেন যে, তাঁহার শরীর এখন খারাপ, কিছু একটা করার মতলব এখন ঠিক হইবে না। সুভাষচন্দ্র তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলেন, যে তাঁহার শরীর এত খারাপ নয়। তিনি আরও বলেন যে আগে রমেশচন্দ্র তাঁহাকে অনেক টাকা দিয়াছেন, তখন ত টাকার কি প্রয়োজন তিনি প্রশ্ন করেন নাই, এখন করিতেছেন কেন? সুভাষের শরীর ভাল আছে জানিয়া রমেশচন্দ্র আনন্দিত বোধ করেন, অতঃপর কি ভাবে কাহার মারফতে টাকা পাঠাইতে হইবে সে সব ব্যবস্থার পর রমেশচন্দ্র বিদায় লইতে অগ্রসর হইতেছেন এমন সময় সুভাষ বলিয়া উঠেন, 'শুনুন, মামীমা'কে আমার প্রণাম জানাবেন।' রমেশচন্দ্র তখন ইহা সাধারণ মামুলি কথা মনে করিয়া চলিয়া আসেন। যথানির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট ব্যক্তির মাধ্যমে রমেশচন্দ্র সুভাষকে প্রার্থিত অর্থ প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করিয়া একদিন রমেশচন্দ্র সংবাদপত্রে সুভাষের গৃহ হইতে অন্তর্ধানের সংবাদ পান। এই সময় তিনি তাঁহার স্ত্রীকে বলেন, "সুভাষ বোধ হয় শেষ বিদায় নিয়ে গেল। রমেশচন্দ্র সখেদে তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন, "তখন জানতাম না যে আমার এই আশঙ্কা নিদারুণ সত্যে পরিণত হবে।" (জীবনের স্মৃতিদীপ—পৃঃ ১৩৩)।

পরবর্তীকালে স্বাধীনতার ইতিহাস লিখিতে গিয়া রমেশচন্দ্র এই মন্তব্য করেন যে ভারতের স্বাধীনতা লাভে সুভাষের অবদান মহাত্মা গান্ধী অপেক্ষা কম নহে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি সাহেব (পরে লর্ড এটলি) ও রমেশচন্দ্রের অনুরূপ মত প্রকাশ করেন। রমেশচন্দ্র নিজ-মতের সমর্থনে এটলির মতটি তাঁহার গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করেন (হিস্ট্রি অফ্ দি ফ্রিডম মুভমেণ্ট, ৩য় খণ্ড, দ্বিতীয় সং পৃঃ ৬০৯—৬১০)। ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের ১৮ আগষ্ট তাইহোকু বিমান বন্দরে দুর্ঘটনা সুভাষচন্দ্রের মৃত্যুর সংবাদ রমেশচন্দ্র কোনদিনই বিশ্বাস করেন নাই। তিনি প্রমাণ করেন যে ২৩ আগষ্ট ভারতের বড়লাট লর্ড ওয়াভেল ভারতসচিব লর্ড পেথিক লরেন্সকে লিখিত চিঠিতে সুভাষচন্দ্রকে এখন কোথায় রাখা হবে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এই চিঠিটি লণ্ডনের রাজকীয় স্টেশনারী অফিস কর্তৃক ১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত— দি ট্রান্সফার অফ পাওয়ার গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডের ১০৭ পৃষ্ঠায়

উল্লিখিত হইয়াছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে মহাত্মা গান্ধীর ঊর্ধে সুভাষচন্দ্রকে স্থান দেওয়ার জন্য রমেশচন্দ্রকে আজীবন জাতীয় সরকারের বিরাগভাজন হইতে হইয়াছিল, তাঁহার নিজের জনপ্রিয়তারও হানি হইয়াছিল, কিন্তু তিনি যাহা সত্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন—তাহাই তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। রমেশচন্দ্রকে অনেকে গান্ধী বিদ্বেষী ঐতিহাসিক রূপে চিহ্নিত করিয়াছেন। লক্ষণীয় গান্ধীজি যে 'মহাত্মা' ছিলেন এবং সমগ্র ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণকে তিনি যে স্বাধীনতা অর্জনে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন একথা রমেশচন্দ্র অস্বীকার করেন নাই। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক রূপে তিনি মহাত্মা গান্ধীর এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক ভুলের যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহা তাঁহার পক্ষে ঐতিহাসিক কর্তব্য বলিয়াই মনে হইয়াছিল। সুভাষ মাহাত্ম্য প্রচার ও গান্ধীজীর বিদূষণ তাঁহার অভীষ্ট ছিল না।

১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দের ১ জুন হইতে ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের ৩০ জুন পর্যন্ত রমেশচন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে কর্মভারমুক্ত রমেশচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া নিজস্ব গৃহে বসবাস শুরু করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার রূপে কাজ করার সময় রমেশচন্দ্র তাঁহার উপর ন্যস্ত বাংলার ইতিহাসের ১৪ খণ্ডের প্রকাশ নানা বাধা বিপত্তির জন্য সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। অবসর গ্রহণের পর প্রচুর পরিশ্রম করিয়া তিনি এই কাজ সম্পূর্ণ করেন। ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার পরিকল্পিত ও সম্পাদিত 'হিস্ট্রি অব বেঙ্গল' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয় (১২)। রমেশচন্দ্র সম্পাদিত এই গ্রন্থটি নিম্নলিখিত সতেরোটি অধ্যায়ে বিভক্ত (১) প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক ভূগোল (২) জনশ্রুতি-মূলক প্রাচীন ইতিবৃত্ত (লিজেণ্ডারী পিরিয়ড) (৩) ৩২৬ খ্রীঃ পূর্বাব্দ হইতে ৩২০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বিবরণ (৪) গৌড় ও বঙ্গের অভ্যুদয় (৫) শশাঙ্কের পরবর্তী বিশৃংখল যুগ (৬) পালযুগ (৭) পাল যুগের কয়েকটি খণ্ড খণ্ড রাজ্য (৮) সেন যুগ (৯) সেন যুগের কয়েকটি রাজবংশ (১০) শাসন ব্যবস্থা (১১) সংস্কৃত সাহিত্য (১২) দেশীয় ভাষার অভ্যুদয় (১৩) ধর্ম—মতবাদ ও মূর্তি কলা (১৪) স্থাপত্য ভাস্কর্য ও চিত্রকলা (১৫) সমাজ (১৬) আর্থিক অবস্থা (১৭) বাংলার বাহিরে বাঙ্গালী—বহির্ভারত ও বঙ্গেতর ভারত। এই গ্রন্থের ৪র্থ হইতে ১ম এবং ১৭শ অধ্যায়—এই সাতটি অধ্যায় রমেশচন্দ্রের নিজস্ব রচনা। ১ম ও ১৫শ অধ্যায় দুটি রমেশচন্দ্র যথাক্রমে রাধাগোবিন্দ বসাক এবং ধীরেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও রাজেন্দ্রচন্দ্র হাজরার সহযোগিতায় রচনা করেন। এই গ্রন্থের প্রথম তিনটি অধ্যায় প্রখ্যাত ঐতিহাসিক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর লেখনী প্রসূত! অন্যান্য অধ্যায়গুলি আংশিক বা এককভাবে ডঃ সুনীলকুমার দে, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচি, ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক সরসীকুমার সরস্বতী, ডঃ নীহাররঞ্জন রায় ও ডঃ প্রভাতচন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক লিখিত। এই গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৭২৯, ইহার সহিত ৮০ পৃষ্ঠার বহু দুর্লভ চিত্র ও মানচিত্র সংযুক্ত হয়। ইতিপূর্বে ভারতবর্ষের কোন রাজ্য বা প্রদেশের এরূপ বিজ্ঞানসম্মত পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হয় নাই। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে পূর্ব প্রস্তাব মত বাংলার ইতিহাস গ্রন্থটি তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। মুসলমান শাসনকালের সূচনা হইতে পলাশী যুদ্ধ পর্যন্ত ইতিহাসের অপর আর একটি খণ্ড সার যদুনাথ সরকারের সম্পাদনায় কিছু দিন পর ঢাকা হইতে

প্রকাশিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত এই দুই খণ্ড ইতিহাস রচনা নৈপুণ্য, সম্পাদনা ও মুদ্রণ পরিপাট্যে ভারতবর্ষে ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে যুগান্তর সৃষ্টি করিয়াছিল। প্রকাশিত হওয়ার তিন চার বৎসরের মধ্যে রমেশচন্দ্র সম্পাদিত প্রথম খণ্ডটির প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়। এই পুস্তক প্রকাশের চারি বৎসরের মধ্যে পূর্ববাংলা তথা ঢাকা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্রভুক্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রমেশচন্দ্রের বহু অনুরোধ সত্ত্বেও হিস্ট্রি অব বেঙ্গলের পুনর্মুদ্রণ প্রস্তাবে সাড়া দেন নাই। তবে একবার তাঁহারা এই বইটি কোন পরিবর্তন না করিয়া পুনর্মুদ্রণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। প্রকাশ কালের ২৫।৩০ বৎসরে অনেক নূতন তথ্য জানা গিয়াছে, এই জন্য রমেশচন্দ্র এই গ্রন্থটি সংশোধন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া পুনর্মুদ্রণের প্রস্তাব করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া মার্কিন দেশ হইতে অর্থসাহায্য লইয়া এই বইটির অবিকল পুনর্মুদ্রণ প্রকাশ করেন। রমেশচন্দ্র ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দে তিনি এই গ্রন্থটি সংশোধিত, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করিয়া কলিকাতা হইতে হিস্ট্রি অফ এনসিয়েণ্ট বেঙ্গল নামে প্রকাশ করেন। পরে হিস্ট্রি অফ মিডিভ্যাল বেঙ্গল ও হিস্ট্রি অফ মডার্ণ বেঙ্গল নামে এই গ্রন্থের অপর দুটি খণ্ডও রমেশচন্দ্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় (১৩)।

১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে রমেশচন্দ্র বোম্বাই এর 'ভারতীয়-বিদ্যাভবন' কর্তৃক পরিকল্পিত আদি যুগ হইতে ইংরেজ শাসনের অবসান কাল পর্যন্ত কালের খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিতব্য ইতিহাস (হিস্ট্রি য়্যাণ্ড কালচার অফ দি ইণ্ডিয়ান পীপল) গ্রন্থমালার সাধারণ সম্পাদক পদ গ্রহণ করেন (জেনারেল এডিটর)। ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দে স্বনামধন্য ব্যবহারজীবী, রাজনীতিবিদ ও স্বদেশ প্রেমিক এবং স্বাধীন ভারতের সংবিধান প্রনেতৃ মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য কানাইয়ালাল মানেকলাল মুন্সী (১৮৮৭-১৯৭১) ভারতীয় সাহিত্য শিক্ষা সংস্কৃতির গবেষণা ও প্রসারের জন্য এই আদর্শ বিদ্যাচর্চা কেন্দ্রটি স্থাপন করেন। দেশের বহু গণ্যমান্য ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের সহায়তায় ও মুন্সীজীর অসাধারণ প্রতিভা, বিদ্যাবুদ্ধি ও সংগঠন কুশলতার জন্য ভারতীয় বিদ্যাভবন বর্তমানে ভারতের একটি উল্লেখযোগ্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রকল্পে পরিণত হইয়াছে। ভারতের নানা স্থানে এমনকি ভারতের বাহিরেও ইহার বহু শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রমেশচন্দ্রের সহিত মুন্সীজীর পূর্ব পরিচয় ছিল না, রমেশচন্দ্র সম্পাদিত "হিস্ট্রি অব বেঙ্গল" ১ম খণ্ড পাঠ করিয়া মুন্সীজী রমেশচন্দ্রের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করেন ও এই কাজে সম্পাদক হিসাবে তাঁহার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে এই আশ্বাস দিয়া তাঁহাকে তাঁহার পরিকল্পিত গ্রন্থমালার সাধারণ সম্পাদক হইতে সম্মত করেন। ইতিপূর্বে দেশনেতা ও পণ্ডিত ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের (পরবর্তীকালে ভারতের রাষ্ট্রপতি) নেতৃত্বে কুড়ি খণ্ডে ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রকাশের এক প্রচেষ্টা হয়। ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসও এবিষয়ে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। পরে এই দুইটি পরিকল্পনা মিলাইয়া একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত হয়, এই পরিকল্পনা অনুসারে একটি মাত্র গ্রন্থ রমেশচন্দ্র কর্তৃক রচিত হইয়া প্রকাশিত হয়, এই গ্রন্থটি রচনায় রমেশচন্দ্রের অপর এক সহযোগী ছিলেন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অনন্ত সদাশিব আল্টেকর। গ্রন্থটি বাকটক ও গুপ্তযুগ বিষয়ে লিখিত (১৪)। রমেশচন্দ্র সম্পাদিত এই গ্রন্থমালার আর একটি খণ্ড রমেশচন্দ্রের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। মুন্সীজীর পরিকল্পনাও হিস্ট্রি কংগ্রেস তথা রাজেন্দ্রপ্রসাদের পরিকল্পনা মিলাইয়া ভারতের ইতিহাস রচনার প্রস্তাবটি রমেশচন্দ্র

কর্তৃক হিস্টি কংগ্রেসের কমিটিতে উত্থাপিত হয়। রমেশচন্দ্রও এই কমিটির সদস্য ছিলেন। রমেশচন্দ্রের এই প্রস্তাবটি গৃহীত না হওয়ায় মুন্সীজী অতঃপর তাঁহার নিজস্ব পরিকল্পনাটি ফলপ্রসূ করার জন্য রমেশচন্দ্রকে প্রস্তাবিত ইতিহাস গ্রন্থমালার সাধারণ সম্পাদক এবং সম্পাদক সমিতির সভাপতি নির্বাচিত করেন। এক এক খণ্ড সম্পাদন করিয়া প্রেসে পাঠাইলে রমেশচন্দ্রের বিনা সম্মতিতে কোন পরিবর্তন করা হইবে না, এবিষয়ে মুন্সীজী রমেশচন্দ্রকে পুনঃ পুনঃ আশ্বস্ত করেন। লেখক নির্বাচন ও তাঁহাদের রচনা ইচ্ছামত পরিমার্জন ও পরিবর্দ্ধনের অধিকারও তাঁহাকে দেওয়া হয়।

মুন্সীজী রমেশচন্দ্রের বোম্বাইএ বাস ও ইতিহাস রচনার কাজের জন্য কবণিক বা টাইপিষ্ট প্রভৃতির সুব্যবস্থা করিয়া দেন। 'হিস্টি য়্যাণ্ড কালচার অফ দি ইণ্ডিয়ান পীপল' গ্রন্থটির প্রকাশ যে বহু বৎসর ধরিয়া চলিতে থাকিবে মুন্সীজীর ইহা অজ্ঞাত ছিল না। এই কাজের পূর্ণ দায়িত্ব হাতে রাখিয়া রমেশচন্দ্র অন্য কোথাও অধ্যাপনা করিতে পারিবেন ও নিজের অভীষ্ট অন্য কোন কাজও করিতে পারিবেন—তাঁহাকে এই স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছিল। এই কাজের দায়িত্ব পাইয়া রমেশচন্দ্র কিছুকাল বোম্বাইএ বাস করেন। এই সময়ে তিনি দশ খণ্ডে প্রকাশিতব্য প্রত্যেকটি খণ্ডের কাল বিষয়বস্তু এবং লেখক নির্বাচন সম্পন্ন করেন। লেখকদের সহিত যোগাযোগও করা হয়। কিছুকাল বোম্বাই বাসের পর রমেশচন্দ্রকে স্বাস্থ্যের কারণে বোম্বাই ত্যাগ করিতে হয়। মুন্সীজী তাঁহাকে যেখানে সুবিধা সেখান হইতেই এই কাজটি বোম্বাই বিদ্যাভবনের সহিত যোগাযোগ রাখিয়া চালাইয়া যাওয়ার অনুমতি দেন। বোম্বাই হইতে কলিকাতায় আসার কিছুদিন পর বারাণসী হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধীনে একটি প্রাচ্যবিদ্যা মহাবিদ্যালয় (কলেজ অফ ইণ্ডোলজি) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থার প্রিন্সিপ্যাল পদে যোগদানের আমন্ত্রণ পাইয়া রমেশচন্দ্র এই পদ গ্রহণ করেন, ১৯৫০ হইতে ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় এই তিন বৎসর কাল রমেশচন্দ্র এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

জাতিসঙ্ঘের (ইউনাইটেড নেশানস) এর বৈজ্ঞানিক, শিক্ষানৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিভাগ (ইউনেস্কো) এর উদ্যোগে এই সময়ে কয়েক খণ্ডে মানবজাতির বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার জন্য একটি আন্তর্জাতিক কমিশন গঠিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডঃ হোমি ভাবা এই প্রতিষ্ঠানে ভারত সরকারের প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। বারাণসীতে কার্যকালে রমেশচন্দ্র ও এই আন্তর্জাতিক কমিশনের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি প্রস্তাবিত গ্রন্থমালার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যও নির্বাচিত হন। পরে তাঁহাকে সম্পাদকমণ্ডলীর সহ-সভাপতির পদ দেওয়া হইয়াছিল। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিশেষ খণ্ডটি সম্পাদনের জন্য রমেশচন্দ্রের প্রস্তাবে ডঃ কে এম পাণিক্কর সহ-সম্পাদক নিযুক্ত হন। মানব জাতির ইতিহাস গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটি দুইভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম খণ্ডে প্রাগৈতি-হাসিক যুগ এবং দ্বিতীয় খণ্ডে খ্রীস্টপূর্ব ১২০০ শতাব্দী পর্যন্ত মানব জাতির সংস্কৃতি, সভ্যতা ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিবরণ। এই দ্বিতীয় খণ্ডটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পুরাতত্ত্ববিদ সার লিওনার্ড উলি কর্তৃক লিখিত হয়।

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি রূপে রমেশচন্দ্র উলির রচনা পড়িয়া বিশেষ বিচলিত হন। তিনি বেদ সম্বন্ধে কিছু লিখেন নাই, তাহার, তাঁহার মতে বেদ খ্রীঃ পূঃ ১২০০ শতাব্দীর পরের রচনা। তিনি লিখেন যে আর্যরা বর্বর জাতি এবং তাহাদের সভ্যতা সিন্ধুসভ্যতার অধিবাসীদের চেয়ে নিকৃষ্ট ছিল এবং

আর্যরা সিন্ধুসভ্যতাকে বলপূর্বক ধ্বংস করিয়াছিল। রমেশচন্দ্র এই রচনাটির প্রতিবাদ করিয়া প্রধান সম্পাদকের নিকট পত্র লিখেন। সম্পাদকমণ্ডলীর সভাতেও রমেশচন্দ্র উলির নানা ভ্রম ও বিকল্প মন্তব্যের প্রতিবাদ করেন। সভায় তীব্র বাদানুবাদের পর স্থির হয় যে রমেশচন্দ্রের বক্তব্যগুলি সার লিওনার্ড উলির নিকট পাঠান হইবে। অতঃপর উলির সহিত রমেশচন্দ্রের বহু তর্ক-বিতর্ক হয়। এই সময় রমেশচন্দ্র এ বিষয়ে ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং জাতীয় স্তরে এ বিষয়ে প্রতিবাদের অনুরোধ করেন। তিনি এই বিষয়ে ভারতে এক বেদ বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত মহারাষ্ট্রবাসী ভি এস আপ্তের অভিমত চাহিয়া পাঠান—শ্রীআপ্তে মন্তব্য করেন যে, ইণ্ডো ইউরোপীয়ান সাহিত্যের সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদ। ঋগ্বেদ পাঠ করার পর আর্যজাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতি যে কত উন্নত ছিল তা বুঝা যায়। ইতিমধ্যে রমেশচন্দ্র এই ইতিহাস কমিশন প্রতিষ্ঠিত জার্ণাল অফ ওয়ারল্ড্ হিষ্ট্রী পত্রিকায়—'দি এণ্টিকুইটি য়্যাণ্ড ইম্পরট্যান্স অফ্ ঋগ্বেদ' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধটির ফরাসী অনুবাদও এই পত্রিকায় ছাপা হয় জার্ণাল অফ ওয়ারল্ড্ হিষ্ট্রী (ষষ্ঠ খণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ পৃঃ ২১৫-২২)। পুনের ভাণ্ডারকর রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট্-এর পত্রিকাতেও রমেশচন্দ্র 'ঋগ্বেদিক সিভিলিজেশন ইন দি লাইট অফ আর্কিওলজি' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন (৪০ খণ্ড, পৃঃ ১-১৫)। এই বাদানুবাদে বিশেষ ফল হয়, সার লিওনার্ড তাঁর মন্তব্যগুলি বিশেষ পরিবর্তন করেন নাই, তবে আর্যদের তিনি অসভ্যের পরিবর্তে অর্ধ-সভ্য রূপে স্বীকার করিয়া লন। ভারত সরকার বহু বিলম্বে বহু সময় নষ্ট করিয়া প্যারিসে সম্পাদকমণ্ডলীর নিকট রমেশচন্দ্রের নির্বাচিত কয়েকজন পণ্ডিতের মতামত যখন পাঠান, তখন উলির লিখিত পুস্তকটির মুদ্রণ কাজ সমাপ্ত প্রায় হইয়াছিল। ভারতের পক্ষ হইতে যথাকালে প্রতিবাদ প্রেরণ করিলে যে প্রতিক্রিয়া হইত রমেশচন্দ্রের একক চেষ্টায় তাহা হইতে পারে নাই। তবে রমেশচন্দ্রের দৃঢ়তায় আপত্তিজনক অধ্যায়ের শেষে রমেশচন্দ্রের প্রতিবাদ এবং এ বিষয়ে উলির মন্তব্য এবং সর্বশেষে সাধারণ সম্পাদকের মন্তব্য সহ এই গ্রন্থটি মুদ্রিত হয় (হিস্টি অফ্ দি সায়াণ্টিফিক য়্যাণ্ড কালচারাল ডেভেলাপমেণ্ট অফ্ দি ম্যানকাইণ্ড, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪০৫-৪০৭, ৪০১, ৪১২, পাদটীকা ৩১ ও ৪৩)। রমেশচন্দ্রের প্রতিবাদ সন্নিবিষ্ট থাকাতে বিশ্বের পাঠক সমাজে অন্ততঃ এই ধারণার সঞ্চার হইতে পারিয়াছিল যে প্রাচীন আর্যজাতি সম্বন্ধে উলির মতামত সর্বজনগ্রাহ্য নহে এবং পক্ষপাত দুষ্ট। মানবজাতির ইতিহাসের "ভারতবর্ষ" সংশ্লিষ্ট খণ্ডটিতে রমেশচন্দ্রের সতর্কতায় ভারত সম্বন্ধে কোন গ্লানিকর তথ্য প্রকাশিত হইতে পারে নাই। পূর্বেই বলা হইয়াছে রমেশচন্দ্রের পরামর্শে অধ্যাপক ডঃ কে-এন-পানিক্কর (এক সময়ে চীনে ভারতের রাষ্ট্রদূত) এই খণ্ডের সম্পাদক নিযুক্ত হন।

১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর রমেশচন্দ্রের মনে এই চিন্তার উদয় হয় যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা ভবিষ্যদ্বংশীয়দের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। রমেশচন্দ্র এই সময়ে সরকারী প্রতিষ্ঠান ইণ্ডিয়ান হিস্টোরিক্যাল রেকর্ডস কমিশনের অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে জয়পুরে এই কমিশনের অধিবেশনে রমেশচন্দ্র এই মর্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবটিতে স্বাধীনতা সংগ্রাম সংক্রান্ত সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী কাগজপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থার প্রস্তাবও ছিল। এই সময়ে গান্ধীজীর স্মৃতির

উদ্দেশ্যে একটি সংগ্রহশালা সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠার কথা চলিতেছিল। রমেশচন্দ্র প্রস্তাব করেন যে গান্ধীজীর জীবন সম্বন্ধীয় সংগ্রহশালায় তাঁহার স্মৃতি বিজড়িত দ্রব্যাদি রক্ষিত হইতে পারে কিন্তু তাঁহার সমস্ত রচনা ও চিঠিপত্র জাতীয় মহাফেজখানায় (ন্যাশনেল আর্কাইভস্) ইতিহাসের উপাদান হিসাবে পৃথকভাবে রক্ষা করিতে হইবে। রমেশচন্দ্রের এই প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় ও গভর্ণমেণ্টকে এবিষয়ে অবহিত করা হয়। বোম্বাই হইতে প্রকাশিত 'নিউ ডেমো'ক্রেট' নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় রমেশচন্দ্র এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন (৭. ৫. ১৯৪৮)। এই প্রবন্ধে রমেশচন্দ্র এই মত প্রকাশ করেন যে স্বাধীনতা সংগ্রামে ইতিহাস রচনার কাজ একজনের দ্বারা সম্ভব নহে। গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এই কাজের দায়িত্ব গ্রহণ প্রয়োজন। এই প্রবন্ধের একটি কপি প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরুর নিকটও প্রেরিত হয়। ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের সহিত পূর্ব হইতেই রমেশচন্দ্রের পরিচয় ছিল। ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ স্বয়ং ইতিহাস অনুরাগী এবং গভীর পাণ্ডিত্য সম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। রমেশচন্দ্রের পত্রের উত্তরে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ তাঁহাকে জানান যে রমেশচন্দ্রের প্রস্তাব তিনি সম্পূর্ণ অনুমোদন করেন এবং রমেশচন্দ্রের নিকট হইতে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা পাইলে তিনি তাহা কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিবেন। এই ঘটনার পর রমেশচন্দ্রকে ভারত সরকারের পক্ষ হইতে জানান হয় যে ভারত সরকার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহের জন্য একটি কমিটি নির্বাচন করিয়াছেন এবং রমেশচন্দ্রকে এই কমিটির অন্যতম সভ্য নির্বাচিত করা হইয়াছে। ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের ৫ জানুয়ারী এই কমিটির প্রথম অধিবেশন হয়। এই কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন ডঃ তারাচাঁদ। ইনি উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর এই ইতিহাস রচনার দায়িত্ব অর্পণের প্রস্তাবটি কমিটির সভায় গৃহীত করাইতে সক্ষম হন। ডঃ তারাচাঁদ এই সময়ে ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রণালয়ের সচিব ছিলেন। তাঁহার গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল দিল্লী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপর এই দায়িত্ব ন্যস্ত হইলে তিনি ও তাঁর পরিচিত লোকেরাই এ বিষয়ে কর্তৃত্ব করিতে পারিবেন। শেষ পর্যন্ত দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় এই কাজের দায়িত্ব লইতে অস্বীকার করিলে ভারত সরকারকেই এই কাজের দায়িত্ব লইতে হয়। সম্ভবতঃ রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের ইচ্ছানুসারেই এই ব্যবস্থা করা হয়। অতঃপর ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর ভারত সরকার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনার জন্য একটি সমিতি গঠন করেন। ডঃ সৈয়দ মামুদ ও সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ যথাক্রমে এই কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক নিযুক্ত হন। অন্য সাতজন সদস্যের মধ্যে রমেশচন্দ্র ও অন্যতম সদস্য হন। পরবর্তীকালে কমিটির একটি সভায় এই গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ, গবেষণা আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা পত্র ও খসড়া রচনার জন্য একজন বেতনভোগী ডিরেক্টর নিযুক্ত করার প্রস্তাব হয়। সর্ব-সম্মতিক্রমে রমেশচন্দ্রকেই এই পরিকল্পনার ডিরেক্টর বা পরিচালক পদে নিযুক্ত করা হয়। সম্পাদক সমিতির যাবতীয় কার্যকরী ক্ষমতা একটি উপসমিতির উপর ন্যস্ত হয়। ইহার সভাপতি ও সম্পাদক হন যথাক্রমে সৈয়দ মামুদ ও সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ। সুরেন্দ্রমোহন নিজেই এই উপসমিতি গঠনের প্রস্তাব করেন। এই উপসমিতিতে রমেশচন্দ্র বা অপর কোন ঐতিহাসিককেও স্থান দেওয়া হয় নাই। এ সম্বন্ধে রমেশচন্দ্রের ধারণা হয় যে কার্যতঃ উপসমিতিকে উপলক্ষ্য করিয়া সম্পাদক (শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ) সকল ক্ষমতা পরিচালনা করিতে ইচ্ছুক। ইনি ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহকে

ব্রিটিশের শাসন উচ্ছেদের জন্য তৎকালীন জাতীয় নেতাদের একটি সঙ্ঘবদ্ধ ও সুপরিকল্পিত সংগ্রাম মনে করিতেন এবং সেই ভাবেই তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনা করাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে রমেশচন্দ্রের সহিত তাঁহার তীব্র বাদানুবাদ হয়। বহুদিন পরিশ্রম করিয়া রমেশচন্দ্র ভারতের স্বাধীনতা ইতিহাসের সংগ্রামের যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন, তাহা শিক্ষামন্ত্রী আজাদের অনুমোদন লাভ করিলেও ইহাতে বাঙালীদের উপরই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে—নানামহলে এই অভিযোগ উত্থিত হয়। দীর্ঘদিন ধরিয়া নানা বাধাবিপত্তির মধ্যেও রমেশচন্দ্র তাঁহার ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করিয়া যাইতে যাইতেও বুঝিতে পারেন যে তাঁহার পরিকল্পনা মত ইতিহাস রচনা সম্পাদক সমিতির সভাপতি বা সম্পাদক কাহারও অভিপ্রেত নহে। ইতিমধ্যে রমেশচন্দ্রের খসড়ার পরিবর্তে ডঃ তারাচাঁদ কর্তৃক প্রস্তুত একটি খসড়া সম্পাদক কর্তৃক আলোচিত হয়। ডঃ তারাচাঁদের খসড়াটিই সম্পাদক সমিতির সদস্যরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানিয়া লন। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনার দায়িত্ব বা এ বিষয়ে কোন কৃতিত্ব তাঁহাকে দেওয়া হইবে না ইহা নিশ্চিন্তরূপে বুঝিতে পারিয়া রমেশচন্দ্র ক্ষুব্ধ হৃদয়ে পরিচালক বা ডিরেক্টরের পদ ত্যাগ করেন। ১৯৫৩ হইতে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনা করার কাজের সহিত রমেশচন্দ্র ডিরেক্টর বা পরিচালক রূপে লিপ্ত ছিলেন। রমেশচন্দ্রের পদত্যাগের পর বোর্ড তুলিয়া দিয়া ডঃ তারাচাঁদকেই এই ইতিহাস রচনার ভার দেওয়া হয়। ডঃ তারাচাঁদকে রমেশচন্দ্রের মত প্রতিপদে বাধার মধ্যে কাজ করিতে হয় নাই। ডঃ তারাচাঁদ লিখিত স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের তিন খণ্ড ১৯৬১ হইতে ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাৎসরিক প্রায় একলক্ষ টাকা আনুষঙ্গিক ব্যয়ে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। অথচ ভারত সরকার এই ইতিহাস প্রকাশের জন্য রমেশচন্দ্রকে ১৯৫৮ পর্যন্তও সময় দিতে সম্মত হন নাই। ডঃ তারাচাঁদের ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস গ্রন্থ দেশে-বিদেশে কোথাও আদৃত হয় নাই, ভারতের লোক সভায় এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য শোনা গিয়াছিল।

দীর্ঘকালের ব্যবধানেও এই গ্রন্থের কোন খণ্ডের পুনর্মুদ্রণ হয় নাই। বিদেশের একটি বিখ্যাত ইতিহাস গবেষণা পত্রিকায় (আমেরিকান হিস্টোরিক্যাল রিভিউ) ডাঃ তারাচাঁদের পুস্তকটির সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছিল যে এই গ্রন্থটি ভারতের পক্ষে তথা ভারত সরকারের পক্ষে অগৌরবজনক। ভারত সরকারের স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস রচনা পরিকল্পনা পর্ষদের ডিরেক্টর পদ হইতে পদত্যাগ করার পর রমেশচন্দ্রকে নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নব প্রতিষ্ঠিত ভারততত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ পদ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ করা হয়। রমেশচন্দ্র কয়েক বৎসর এই পদে কাজ করিয়া এই প্রতিষ্ঠানকে সুসংগঠিত করেন। ১৯৫৮-৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো ও পেনসিল ভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ইতিহাস সম্বন্ধীয় পরিদর্শক অধ্যাপক রূপে (ভিজিটিং প্রফেসর) কিছুকাল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বাস করেন।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনার দায়িত্ব তাঁহাকে লইতে হইবে ইহা অনুমান করিয়া ১৯৫৩ হইতে ১৯৫৫ পর্যন্ত প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের ছাত্র রমেশচন্দ্র ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বকাল সম্বন্ধে গভীরভাবে অধ্যয়ন সুরু করেন ও নিজস্ব চেষ্টায় এ বিষয়ে বহু উপকরণ সংগ্রহ করেন। নানা ষড়যন্ত্রের ফলে যখন তাঁহাকে উপরিউক্ত কাজের সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা হয় তখন সরকারী দাক্ষিণ্যের ভরসা না করিয়া দৃঢ়চেতা রমেশচন্দ্র নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনায়

ব্রতী হন। সর্বপ্রথম তিনি সিপাহী বিদ্রোহের শতবর্ষ পূর্তি বৎসরে তাঁহার সিপাহী বিদ্রোহ সংক্রান্ত পুস্তকটি নিজের চেষ্টায় প্রকাশ করেন (১৫)। সিপাহী বিদ্রোহকে ভারতবাসীর প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম রূপে মানিয়া লইতে তিনি অস্বীকার করেন। ব্যক্তিগতভাবে সিপাহী বিদ্রোহের কয়েকজন নেতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ সত্ত্বেও তিনি ইহা কতিপয় স্বার্থান্বেষী সামন্ততান্ত্রিক ব্যক্তির উচ্চাভিলাষ পূরণের অপচেষ্টা বলিয়া বর্ণনা করেন। সিপাহী বিদ্রোহকালের দুই সমসাময়িক মনীষী হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও নির্যাতীত মানুষের বন্ধু সাম্যবাদের প্রবক্তা মহামতি কার্ল মার্কসের মতের সহিত রমেশচন্দ্রের মতের বহু সাদৃশ্য দেখা যায়। একশ্রেণীর ঐতিহাসিকের মধ্যে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী যুদ্ধকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ রূপে বর্ণনা বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দেখা দিয়েছিল। এই ঐতিহাসিকদের সহিত রমেশচন্দ্রকে বহুদিন ধরিয়া বাক্-বিতণ্ডা চালাইতে হইয়াছিল। ভাবাবেগের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক সত্যকে প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া এই সময়ে ও ইহার পরেও রমেশচন্দ্রকে বহু ব্যক্তির এমন কি সরকারেরও বিরাগভাজন হইতে হইয়াছিল। অতঃপর রমেশচন্দ্র ১৯৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনটি সুবৃহৎ খণ্ডে ২০২০ পৃষ্ঠায় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস প্রকাশ করেন (১৬)। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের শেষ ভাগে একটি পরিশিষ্টে কি অবস্থায় পড়িয়া তাঁহাকে স্বাধীনভাবে এই গ্রন্থটি রচনা করিতে হয় তাহা বর্ণিত হইয়াছে। রমেশচন্দ্রের এই গ্রন্থটি দেশে ও বিদেশে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি অমূল্য ও যথাযথ 'দলিল' রূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া ভারত সরকার ডঃ তারাচাঁদ লিখিত স্বাধীনতা আন্দোলনের যে ইতিহাস প্রকাশ করেন তাহা অসংলগ্ন, পক্ষপাতদুষ্ট ও অর্দ্ধসত্যের আকর রূপে কুত্রাপি সমাদৃত হয় নাই। রমেশচন্দ্রের জীবদ্দশাতেই তাঁহার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস গ্রন্থের তিনটি খণ্ডেরই পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজন হইয়াছিল।

ভারতীয় বিদ্যাভবন পরিকল্পিত ইতিহাস গ্রন্থ সম্পাদনার দায়িত্ব ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে গ্রহণ করিয়া রমেশচন্দ্র প্রথমে কিছুদিন বোম্বাই বাস করেন সেখানে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল না থাকায় তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তারপর কার্যোপলক্ষ্যে তাঁহাকে বারাণসী, দিল্লী ও নাগপুরে থাকিতে হয়, ইহার মধ্যে তাঁহাকে নানা প্রয়োজনে ইউরোপ ও আমেরিকায়ও যাইতে হয়। বোম্বাই ত্যাগ করার পর হইতে যেখানে যে কাজেই লিপ্ত থাকুননা, রমেশচন্দ্র 'হিষ্ট্রী য্যাণ্ড কালচার অফ্ দি ইণ্ডিয়ান্ পীপল' সম্পাদনার কাজটি অন্যান্য কাজের সঙ্গে সঙ্গেই চালাইয়া যাইতেন। মুন্সীজী তথা ভারতীয় বিদ্যাভবনের সহিত তিনি নিয়মিত যোগাযোগ রাখিয়া চলিতেন। নিরলস পরিশ্রমের ফলস্বরূপ এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড 'বৈদিক যুগ' সম্বন্ধীয় প্রথম খণ্ড ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। অভিনবত্বও উপাদেয়তার কারণে অল্পদিনের মধ্যেই ইহার পুনর্মুদ্রণের আয়োজন করিতে হয়। এই গ্রন্থমালা প্রথমদিকে দশখণ্ডে প্রকাশিত হইবার কথা ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইহা ১১টি খণ্ডে প্রকাশ করিতে হয়। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত আধুনিক যুগের ইতিহাসের জন্য আর একটি খণ্ডের প্রয়োজন হইয়াছিল। ১০ম ও ১১শ খণ্ড দুইটি ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ৯ম হইতে ১১ খণ্ড পর্যন্ত গ্রন্থগুলি ১৯৬৯ এর মধ্যে বাহির হইলেও নানা কারণে মধ্যবর্তী দুইটি খণ্ড (৭ম ও ৮ম) মুদ্রিত হইতে পারে নাই। এই দুইটি খণ্ড মুঘল যুগ ও মারাঠা সাম্রাজ্য বিস্তার বিষয়ক ছিল। এই গ্রন্থমালার মারাঠা সাম্রাজ্য সম্বন্ধীয় ৮ম খণ্ডটি ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ আগষ্ট দিল্লীতে তৎকালীন

প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই এর নেতৃত্বে এক বিরাট জনসভায় আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয়। ৭ম খণ্ডটি ইহার পূর্বেই ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। ৮ম খণ্ডটি প্রকাশের পর একাদশখণ্ডের এই গ্রন্থমালার প্রকাশ সম্পূর্ণ হয়। পূর্বোক্ত অনুষ্ঠানে এই গ্রন্থমালার সাধারণ সম্পাদক হিসাবে রমেশচন্দ্রকেও বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত করা হয়। দুঃখের বিষয় এই পরিকল্পনার জনক ও প্রাণপুরুষ ভারতীয় বিদ্যাভবনের প্রতিষ্ঠাতা এবং ভারত মাতার অন্যতম সুসন্তান এই শেষ খণ্ডের প্রকাশ দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। ইতিপূর্বে ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থমালার ১০ম খণ্ডটির প্রকাশের কিছুকাল পরেই তিনি ৮৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। ১১টি খণ্ডে বিভক্ত এই গ্রন্থমালার ৫টি খণ্ড প্রাচীন ভারত, ৩টি খণ্ড মধ্যযুগ ও তিনটি খণ্ড আধুনিক ভারতের ইতিহাস বর্ণনায় নিয়োজিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসকে সচরাচর হিন্দু, মুসলিম ও ইংরাজ শাসন এই তিনভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রাক্-মুসলিম যুগের ভারত ইতিহাসের ব্যাপ্তি চারি সহস্র বৎসর, ৫০০ বৎসরের মুসলমান ও ১৫০ বৎসরের ইংরাজ শাসনের ইতিহাসকে ৪০০০ বৎসরের প্রাচীন ইতিহাসের মত সমান গুরুত্ব দেওয়া হইয়া থাকে, রমেশচন্দ্র ভারত ইতিহাস রচনায় এই চিরাচরিত প্রথাকে অবৈজ্ঞানিক প্রথা মনে করিয়া এই প্রথা লঙ্ঘন করেন। এই পুস্তকের মহাত্মা গান্ধীর রাজনৈতিক মূল্যায়ন, মোপলা বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ প্রভৃতি বিষয়ে মুন্সীজীর মতামত ভিন্ন ছিল, এই সব বিষয়ে তিনি তাঁহার নিজস্ব মতামত সংশ্লিষ্ট খণ্ডগুলির স্বলিখিত ভূমিকায় (ইন্ট্রোডাকসন) ব্যক্ত করিয়াছিলেন কিন্তু গ্রন্থমধ্যে রমেশচন্দ্রকে তিনি স্বমত ব্যক্ত করিতে বাধা দেন নাই। পূর্ব প্রতিশ্রুতিমত প্রেসে রমেশচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রেরিত পাণ্ডুলিপিতে তিনি কোন হস্তক্ষেপ করেন নাই। রমেশচন্দ্র এই জন্য আজীবন মুন্সীজীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। এই ৩০ বৎসর পরিশ্রমে প্রকাশিত এগারটি বৃহদাকার খণ্ড সমন্বিত এই গ্রন্থমালাকে মোট পৃঃ সংখ্যা নবম সহস্র (৯,০০০) এতদ্ব্যতীত এই গ্রন্থমালার ২৮৩টি পৃষ্ঠা চিত্রালঙ্কৃত, গ্রন্থমালায় ২০টি মানচিত্রও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই পুস্তকটির অধিকাংশ ভাগ রমেশচন্দ্রের স্ব লিখিত রচনা, অন্যের লিখিত অধ্যায়গুলির প্রতিটি পংক্তি রমেশচন্দ্র কর্ত্তৃক পঠিত ও অনুমোদিত এবং প্রয়োজনস্থলে সংশোধিত হয়। ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি গ্রন্থ সম্পাদনায় রমেশচন্দ্র কুত্রাপি স্বদেশ প্রেমিকের ভূমিকা গ্রহণ করেন নাই। যেখানে প্রয়োজন হইয়াছে সেখানে লোকবিশ্রুত ইতিহাস নায়কদের দোষ ত্রুটির সমালোচনা করিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। রমেশচন্দ্র সম্পাদিত ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি গ্রন্থমালার ১১টি খণ্ড বিশ্বের বিদ্বৎ সমাজে কেম্ব্রিজ হিষ্ট্রি অফ্ ইণ্ডিয়ার গৌরব ম্লান করিয়া দিয়াছে। এই গ্রন্থমালার অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে ইহার সব কটি অধ্যায়ই ভারত-বাসীর দ্বারা লিখিত। ভারতের ইতিহাস রচনায় এতকাল ইউরোপীয় বিশেষতঃ ইংরাজ লেখকদের একাধিপত্য ছিল। ভারতের অতীত সম্বন্ধে অজ্ঞতা এবং ভারতীয় মানসিকতার সহিত সহ-মর্মিতার অভাবে ইউরোপীয় লেখকদের রচনা পক্ষপাত দুষ্ট হইত। 'ভারতীয় গণের ইতিহাস ও সংস্কৃতি' গ্রন্থমালার পরিকল্পকেরা বিশেষতঃ মুন্সীজী এই কারণেই এই গ্রন্থমালা প্রকাশে উদ্যোগী হইয়াছিলেন (১৭)।

'ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি' গ্রন্থমালা সম্পাদন, বারাণসী ও নাগপুরে ইতিহাসের অধ্যাপনা কয়েক বৎসর ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনা প্রকল্পের কারণে দিল্লীবাস, নানা প্রয়োজনে

বিদেশে ভ্রমণ ইত্যাদি নানা কাজে ব্যস্ত থাকিয়াও কর্মযোগী রমেশচন্দ্র অবসর পাইলেই তাঁহার প্রিয় অন্যান্য বিষয়ে গবেষণা ও গ্রন্থ রচনায় ক্ষান্ত হইতেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতামালা দানের আমন্ত্রণ পাইয়া ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে রমেশচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর এক প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতা মহারাজা রাজবল্লভ সম্বন্ধে কয়েকটি ভাষণ দেন। বহু ঐতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ রমেশচন্দ্রের এই ভাষণমালা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় (১৮)। সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য ভারতবর্ষের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস গ্রন্থের অভাব দূরীকরণার্থে রমেশচন্দ্র অপর দুটি প্রখ্যাত ঐতিহাসিক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী ও কালিকিঙ্কর দত্তের সহযোগিতায় একটি ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন। লণ্ডনের সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক ব্যবসায়ী ম্যাকমিলান কোম্পানী ইহা প্রকাশ করেন। এই পুস্তকটি প্রাচীন ভারত, মধ্যযুগের ভারত, দিল্লী সুলতান ও মুঘল রাজত্বকাল ও আধুনিককাল এই চারিভাগে বিভক্ত। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত এই গ্রন্থটির অনেকগুলি সংস্করণ হইয়াছে, প্রতিটি সংস্করণই সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত (১৯)।

১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দে রমেশচন্দ্র 'ক্লাসিক্যাল একাউন্টস্ অফ্ ইণ্ডিয়া' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে হেরোডোটাস, মেগাস্থানীস প্রভৃতি প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিকদের লিখিত ভারত বিবরণ সংক্রান্ত অংশগুলি ইংরাজীতে অনূদিত হইয়া সন্নিবিষ্ট হয় (২০)। ১৯৪৯-৬০ খ্রীস্টাব্দে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে রমেশচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সম্বন্ধে ইংরাজীতে কতকগুলি ভাষণ দেন। এই ভাষণ মালা পরে 'রিসার্জেন্স অফ বেঙ্গল ইন দি নাইনটিনথ সেঞ্চুরী' নামে প্রকাশিত হয় (২১)। ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে রমেশচন্দ্র 'গিরিশচন্দ্র ঘোষ' বক্তৃতা দান করেন। এই ভাষণমালার বিষয়বস্তু ছিল "ভারতীয় ধর্ম"। ইহা গ্রন্থাকারে ইংরাজীতে প্রকাশিত হয় (২২)।

স্বামী বিবেকানন্দ তথা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের প্রতি রমেশচন্দ্রের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। বিবেকানন্দের জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষ্যে যে স্মারক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় রমেশচন্দ্র তাহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন (২৩)। বিবেকানন্দ শতবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠানেও তাঁহার বিশেষ ভূমিকা ছিল। এই সময় পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে তিনি বিবেকানন্দ বিষয়ে ইংরাজীতে তিনটি ভাষণ দান করেন এই ভাষণমালা ইংরাজীতে প্রকাশিত হয় (২৪)। ভারতের নবজাগরণ সম্বন্ধে লিখিত ইংরাজী পুস্তকটিতে রমেশচন্দ্র ভারতীয় জাতির নবচেতনার উন্মেষে বিবেকানন্দের প্রভাব কত গভীর ছিল তাহা বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন (২৫)। কর্মজীবনের প্রারম্ভে রমেশচন্দ্রের সঙ্কল্প ছিল যে তিনি খণ্ডিত ভারত বা বৃহত্তর ভারতের ইতিহাস রচনাতেই জীবনাতিপাত করিবেন—এই উদ্দেশ্যে তিনি কয়েকখানি পুস্তকও রচনা করেন কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনা উপলক্ষ্যে তাঁহার ঐতিহাসিক গবেষণা ভিন্ন স্রোতে প্রবাহিত হইলেও হিন্দু উপনিবেশ বিষয়ক গবেষণার প্রেরণা তাঁহাকে এবিষয়ে নিষ্ক্রিয় রাখিতে পারে নাই। আমেদাবাদে বি-জে-ইলটিটিউটের আহ্বানে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব সম্বন্ধে তিনি কয়েকটি ভাষণ দেন। ১৯৬২ ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় (২৬)। কিছুদিন পর জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে তিনি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় হিন্দু উপনিবেশ ও সংস্কৃতি বিষয়ে কয়েকটি ভাষণ দান করেন। ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় (২৭)। পর

বৎসর বরোদায় অনুরূপ বিষয়ে রমেশচন্দ্র কতকগুলি ভাষণ দেন, ইহাও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় (২৮)। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় সংস্কৃত ভাষার প্রচারও প্রসার সম্বন্ধেও রমেশচন্দ্র একটি গ্রন্থ রচনা করেন (২৯)। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণায় রমেশচন্দ্র সমগ্র বিশ্বের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য পুরুষ বলিয়া বিবেচিত হন। তাঁহার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সংক্রান্ত রচনায় এই অঞ্চলের প্রায় ১৮০০ বৎসরের ইতিহাস বিধৃত হইয়াছে। একাদশ শতাব্দীর পর হইতে ভারতের সহিত ঘনিষ্ঠময় ভারতের প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ধারা ক্ষীণ হইয়া পড়ে। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্রের মতে ভারতীয় হিন্দু জাতির নৈতিক অধঃপতনই ইহার কারণ। জাতীয় সৌরব বোধ, স্বাধীনতা স্পৃহা প্রভৃতি মহৎ গুণগুলি বিসর্জন দিয়া এই সময় হইতেই হিন্দুজাতি স্বার্থপরতা, আচার সর্বস্বতা ও সঙ্কীর্ণতার বলি হইয়া উঠিতে থাকে।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বা বিষৎসংস্থার আহ্বানে রমেশচন্দ্রকে বহু ভাষণ দিতে হয়—ইহার মধ্যে অনেকগুলি উল্লেখ করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি ভাষণ উল্লেখযোগ্য। ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দে ভারতীয় বিদ্যাভবনের উদ্যোগে 'বিড়লা বক্তৃতামালায়' রমেশচন্দ্র 'ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের তিন পর্যায়' আখ্যায় যে ভাষণ দান করেন সেটি প্রকাশিত হওয়ার অল্পদিন পরেই নিম্নোক্ত হওয়ায় সেই বৎসরই ইহার পুনর্মুদ্রণ আবশ্যক হয় (৩০)। ১৯৬৮ খ্রীস্টাব্দে মণিপুর রাজ্যের একটি গবেষণা সংস্থার আহ্বানে রমেশচন্দ্র যে ভাষণ দেন তাহার বিষয়বস্তু ছিল পূর্বভারতে আর্য সভ্যতার বিস্তার, ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় (৩১)। ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দে কেরল বিশ্ববিদ্যালয় রমেশচন্দ্রকে 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বক্তৃতামালা' দিতে আহ্বান করেন। ইংরাজী ভাষায় এই ভাষণমালার বিষয়বস্তু ছিল হিন্দু-সংস্কৃতির উপর ব্রিটিশ প্রভাব (৩২)। ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির আহ্বানে রমেশচন্দ্র রামমোহন রায় সম্পর্কে বিমানবিহারী মজুমদার বক্তৃতামালায় কতকগুলি বক্তৃতা দেন (৩৩)। এই বৎসর রাজা রামমোহন রায়ের জন্মের দ্বিশত বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে দেশের নানাস্থানে নানা অনুষ্ঠানে রামমোহনের প্রতি জাতির শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়। এই অনুষ্ঠানকালে এবং ইহার বহু পূর্ব হইতেই রামমোহনের এমন কতকগুলি কীর্তি ঘোষিত হইয়াছিল—যাহা ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্রের দৃষ্টিতে ভ্রান্ত ছিল। রামমোহন সম্বন্ধীয় ভাষণ মালায় রমেশচন্দ্র রামমোহনকে সতীদাহ-প্রথার নিবারণ কর্তা, হিন্দু-কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও বাংলা গদ্যের জনক রূপে স্বীকার করিয়া লন নাই। তাঁহার মতে রামমোহন সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন ইহা সত্য কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নের কৃতিত্ব ভারতের তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের প্রাপ্য। ইনি ভারতে পদার্পণ করার পূর্ব হইতেই এই ঘৃণিত প্রথা রোধে সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি আরও বলেন, যে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় রামমোহনের কোন হাত ছিল না, ডেভিড হেয়ার ও কয়েকজন হিন্দু-সমাজপতির চেষ্টাতেই হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। রামমোহন গৌড়ীয় ভাষায় ব্যাকরণ রচনা করেন এবং বাংলার গদ্য রচনাতে তিনি দক্ষতা দেখান কিন্তু তিনি বাংলা গদ্যের জনক নহেন; মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার, রামরাম বসু প্রভৃতি গদ্য লেখকেরাও তৎপূর্বে আবির্ভূত হন, বাংলা গদ্যের সৃষ্টি ও বিকাশে রামমোহন পথিক ছিলেন না। রামমোহনের জন্ম হয় ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে; ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে নহে ইহাও তিনি দক্ষতার সহিত প্রমাণ করেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনার পর রমেশচন্দ্রকে গান্ধীজীর রাজনৈতিক

ভুল-ভ্রান্তির সমালোচনার জন্য গান্ধীভক্তেরা রমেশচন্দ্রকে গান্ধী-বিরোধী রূপে চিহ্নিত করেন। রামমোহন ভক্তেরা এখন রমেশচন্দ্রকে রামমোহন-বিরোধী রূপে চিহ্নিত করিয়া তাঁহার বিরূপ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন। রমেশচন্দ্র গান্ধী-বিরোধী ছিলেন না, তিনি ঐতিহাসিক হিসাবে তাঁহার কর্মধারার মধ্যে যে আপাত-বিরোধিতা ও দোদুল্যমানতা সময়ে সময়ে দেখা দিত তাহার সমালোচনা করেন। মৌলানা আজাদ তাঁহার ভারতের স্বাধীনতালাভের ইতিহাসেও গান্ধীজীর সমালোচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ গান্ধী-বিদ্বেষী বলে না। রমেশচন্দ্র তাঁহার রচনার সর্বত্রই গান্ধীজীর নামের পূর্বে 'মহাত্মা' অভিধাটি যোগ করিতেন। ইহা গান্ধীজীর অনন্যসাধরণ চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত মনোভাবেরই পরিচায়ক। রামমোহন যে ভারতীয় জাতীয় জাগরণের একজন অগ্রদূত তাহা রমেশচন্দ্র অস্বীকার করেন নাই। রামমোহনকে তিনি বিরাট পুরুষ ('এ কলোসেল ফিগার স্ট্রাইডিং ইন দি করিডোরস্ অফ দি নাইটিনথ সেঞ্চুরী') রূপে স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁর মত এই ছিল যে রামমোহনের জন্মকালে দেশের মধ্যে নবজাগরণের পরিবেশ সৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল (হোয়েন হি ওয়াজ বরণ্ রেঁনেশা ওয়াজ জাস্ট এরাউণ্ড দি কর্ণার)। ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই এর একটি বিদ্বৎ সংস্থা হেরাস্ ইন্সষ্টিটিউটের আহ্বানে রমেশচন্দ্র ভারতের ইতিহাস রচনা প্রণালী সম্বন্ধে কতকগুলি ভাষণ দেন। ইহা পুস্তককারে প্রকাশিত হয় (৩৪)। ১৯৭৮ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আহুত হইয়া রমেশচন্দ্র বাংলায় বিপ্লব আন্দোলন এবং এই আন্দোলনে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনখ্যাত বিপ্লবী নেতা সূর্য সেনের ভূমিকা সম্পর্কে ইংরাজীতে কয়েকটি ভাষণ দান করেন, ইহা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় (৩৫)। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বাঙালী তরুণের সশস্ত্র বিপ্লববাদে দীক্ষা শুরু হয়, ইহার প্রায় দুই যুগ পরে সূর্য সেনের অভ্যুদয়। ১৯:৪ খ্রীষ্টাব্দে ফাঁসি-কাষ্ঠে সূর্য সেন জীবনাহুতি দেন। বাঙালী বিপ্লবী তরুণদের প্রতি যুবক রমেশচন্দ্র পরম শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন। নবতিবর্ষীয় ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র এই বক্তৃতায় বাঙালী বিপ্লবী তরুণগণের অন্যতম প্রতিনিধি সূর্য সেনের (১৮৯০-১৯৩৪) স্মৃতির উদ্দেশ্যে তাঁহার অন্তিম শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেন। সম্ভবতঃ কোন বিদ্বৎসংস্থা অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে এইটিই তাঁহার শেষ বক্তৃতা।

১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী সারদামাতার জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ভারতের মহিয়সী নারীগণের বিষয়ে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়, কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ-জননী শ্রীশ্রীসারদাদেবী ছিলেন ভারতীয় নারীর শাশ্বত প্রতীক। রমেশচন্দ্র আলমোড়ায় রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী মাধবানন্দের সহযোগিতায় ইহা সম্পাদনা করিয়া প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের কয়েকটি অধ্যায় তাঁহার স্বরচিত (৩৬)। ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেস পরিকল্পিত ইতিহাসের ষষ্ঠ খণ্ডটি (বাকটক-গুপ্ত যুগ)টি রমেশচন্দ্র ডঃ আলটেকরের সহযোগিতায় রচনাও প্রকাশ করেন, একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই গ্রন্থমালার আর একটি খণ্ড রচনাসহ সম্পাদনা রমেশচন্দ্র মৃত্যুর বহু বৎসর পূর্বে করিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর পর এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় (৩৭)। রমেশচন্দ্র সারাজীবনে বহু গ্রন্থ সম্পাদনা করেন, এজন্য কিছু কিছু ব্যক্তি মনে করেন যে ইতিহাস-গ্রন্থ সম্পাদনেই তাঁহার কৃতিত্ব সীমাবদ্ধ ছিল। এই ধারণা নিরসনের জন্য বলা যাইতে পারে যে, অন্য লেখকের প্রতিটি রচনা তাঁহাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিতে হইত। এই সব রচনার কোন কোন অংশ তাঁহাকে সংশোধন করিয়া দিতেও

হইত, সময় সময় সংযোজন বা পরিবর্দ্ধন করিতে হইত। বস্তুতঃ তাঁহার সম্পাদিত গ্রন্থমালার প্রায় সত্তরটি অধ্যায় তাঁহার নিজের রচনা। মৌলিক গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনার অবসরে দেশ ও বিদেশের পত্র পত্রিকায় রমেশচন্দ্র তিন শতেরও অধিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

রমেশচন্দ্রের পূর্বপুরুষদের মধ্যে অনেকে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। উত্তরাধিকারসূত্রে রমেশচন্দ্রের অন্তরে সংস্কৃতের প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল। তিনি উত্তমরূপে সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করেন। বেদ, পুরাণ, স্মৃতিগ্রন্থ প্রভৃতিও তিনি উত্তমরূপে অধ্যয়ন করেন। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় সংস্কৃত শাস্ত্র সাহিত্যের সহিত এই পরিচয় তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত 'রামচরিত' নামে একটি কাব্যগ্রন্থের পুঁথি টীকাসহ উদ্ধার করিয়া আনেন। ঐ টীকাটি অসম্পূর্ণ ছিল। এই গ্রন্থটিতে বাংলার পালযুগ সম্বন্ধে নানা তথ্য পাওয়া যায়। শাস্ত্রী মহাশয় খণ্ডিত টীকার সাহায্যে এই গ্রন্থের একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। রমেশচন্দ্রের মনে এই ধারণা হয় যে শাস্ত্রী মহাশয় খণ্ডিত টীকার সাহায্যে রামচরিতের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা যথাযথ নহে। সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত রামচরিতের একটি নির্ভুল সংস্করণ প্রকাশিত হইলে পাল যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে যথার্থ গবেষণার পথ সুগম হইবে। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া রমেশচন্দ্র কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে রামচরিত গ্রন্থটির পুঁথি আনাইয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাকের সহিত একত্রে বসিয়া রামচরিতের একটি নির্ভুল পাঠ স্থির করেন। যে অংশের টীকা ছিল না, সেই অংশেরও টীকা প্রস্তুত করা হয়। এই গ্রন্থের পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠার একটি ইংরাজী ভূমিকায় রমেশচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের নানা মতের প্রতিবাদ করেন। উত্তরকালে ঐতিহাসিকদের নিকট রমেশচন্দ্রের মতগুলিই অভ্রান্ত প্রতিপন্ন হইয়াছে। রমেশচন্দ্র, ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক ও পণ্ডিত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত রামচরিতের এই সংস্করণটি রাজশাহীর বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয় (৩৮)। পরবর্তীকালে ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক একক ভাবে ইহা বাংলা ও ইংরাজী অনুবাদ সহ সম্পাদনা করিয়া প্রকাশ করেন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র রাজবিজয় নাটক নামে একটি সংস্কৃত নাটক অপর একজনের সহযোগিতায় সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন (৩৯)।

মাতৃভাষা বাংলার প্রতি রমেশচন্দ্রের গভীর অনুরাগ ছিল। কলেজে অধ্যয়ন কালে একটি কবিতা লিখিয়া তিনি পুরস্কার পান। ছাত্রাবস্থায় কুলদাপ্রসাদ মল্লিক নামে এক সহপাঠীর সাহায্যে তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রথমরসাস্বাদন করেন এবং রবীন্দ্রনাথের পরম অনুরাগী পাঠক-ভক্তে পরিণত হন। কুলদাপ্রসাদ বীরভূমি নামে একটি পত্রিকা সম্পাদন করিতেন, ইহাতে রমেশচন্দ্রের একটি বাংলা প্রবন্ধ সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী ও ঢাকার অধ্যাপক অবিনাশ মজুমদার তাঁহাকে বাংলা সাহিত্যের রচনায় অনুপ্রাণিত করেন। গিরিজাশঙ্কর সম্পাদিত 'দেবালয়' এবং অবিনাশচন্দ্র সম্পাদিত ঢাকা হইতে প্রকাশিত 'প্রতিভা' পত্রিকায় রমেশচন্দ্রের লিখিত অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বঙ্গভাষানুরাগী রমেশচন্দ্র প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র তাঁহার অতি প্রিয় লেখক ছিলেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিক বাঙালী সাহিত্যিকদের রচনার সহিতও তাঁহার পরিচয়

ছিল। প্রচলিত নিয়ম-কানুন ভাঙিয়া তিনিই উচ্চতর শিক্ষায় বঞ্চিত ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. লিট উপাধিতে ভূষিত করার ব্যবস্থা করেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ রমেশচন্দ্রকে এবং তাঁহার পরিবারবর্গকে বিশেষ স্নেহ ও প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। শেষ-জীবনের দিনগুলিতে রবীন্দ্র-সঙ্গীত শ্রবণ রমেশচন্দ্রের নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম ছিল। রমেশচন্দ্র শরৎচন্দ্রেরও বিশেষ প্রীতিভাজন ছিলেন। কবি মোহিতলাল মজুমদারের সহিত রমেশচন্দ্রের গভীর সৌহার্দ্য ছিল। গবেষণামূলক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা, অধ্যাপনা ও প্রশাসনিক কাজে সদা ব্যস্ত রমেশচন্দ্র বাংলাভাষায় বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। "ভারতবর্ষ", 'ইতিহাস', বাসন্তিকা (ঢাকা), 'মানসী ও মর্মবাণী' 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা', 'বিশ্বভারতী পত্রিকা' প্রভৃতি সাময়িক পত্রে রমেশচন্দ্রের বহু বাংলা রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহিত রমেশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ তাঁর জীবন-সায়াহ্ন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। ১৩০৩ বঙ্গাব্দে তরুণ রমেশচন্দ্র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চিত্রশালাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে আহূত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের দুইটি অধিবেশনে রমেশচন্দ্র ইতিহাস শাখার সভাপতিত্ব করেন (মুন্সীগঞ্জ—১৩৩১ বঙ্গাব্দ, মাজু—১৩৩৫ বঙ্গাব্দ)। পরবর্তীকালে তিনি কয়েকবার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি পদে বৃত হইয়াছিলেন। কয়েক বৎসর তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব ভারও বহন করেন (১৯৬৬-১ ৬৯)। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশিষ্ট সদস্যও নির্বাচিত হন। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় তাঁহার বহু জ্ঞান-গর্ভ রচনা প্রকাশিত হয়। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে জয়পুরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ইতিহাস শাখার সভাপতি রূপে তিনি যে ভাষণ দান করেন তাহা 'ইতিহাসের বিকৃতি' নামে 'শিক্ষক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (অগ্রহায়ণ, ১৩৬০)।

ঢাকা হইতে কলিকাতায় স্থায়ী ভাবে বাস করিতে আসিয়া রমেশচন্দ্র তাঁহার সম্পাদিত 'হিষ্ট্রি অফ্ বেঙ্গল' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রাচীন যুগ—"বাংলার ইতিহাস" নামে প্রকাশ করেন। বাঙ্গালী পাঠকেরা এই সর্বপ্রথম বাংলার ইতিহাসের প্রাচীন যুগ সম্বন্ধে একটি ধারাবাহিক সুসবদ্ধ ইতিহাসের পাঠের সুযোগ পায়। ২০ বৎসরের মধ্যে এই গ্রন্থের চারিটি সংস্করণ প্রকাশ করিতে হইয়াছিল। পরবর্তীকালে রমেশচন্দ্র এই গ্রন্থের আরও তিনটি খণ্ড প্রকাশ করেন (৪০)।

এক সময়ে বাংলার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে দুটি গোষ্ঠী ছিল। এক গোষ্ঠীতে ছিলেন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রমাপ্রসাদ চন্দ, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। ইঁহারা পাথুরে প্রমাণে পক্ষপাতী ছিলেন, রমেশচন্দ্র এই গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন। অপর গোষ্ঠীর প্রধান ছিলেন নগেন্দ্রনাথ বসু, ইনি সাহিত্য পরিষদের অন্যতম প্রধান ছিলেন, স্বভাবতঃই ইনি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের পৃষ্ঠপোষকতা পাইতেন। কতকগুলি জাল পুঁথির উপর নির্ভর করিয়া নগেন্দ্রনাথ বসুর গ্রন্থ ও নিবন্ধাদি রচিত হইত, কুলজী গ্রন্থগুলি নগেন্দ্রনাথ বসু ও তাঁহার অনুগামীদের উপজীব্য ছিল এই সব কুলজী গ্রন্থে লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে বলা হইত যে মহারাজা আদিশূর বঙ্গে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের বাংলায় লইয়া আসেন, বাংলার বর্তমান ব্রাহ্মণ ও কায়স্থরা ইহাদের বংশধর। অক্ষয় মৈত্রেয়, রমাপ্রসাদ চন্দ প্রভৃতি আদিশূরের অস্তিত্ব মানিতেন না। নগেনবাবু বলিতেন যে পূর্ববঙ্গের এক ব্রাহ্মণ বিধবার নিকট রক্ষিত হরিমিশ্রের ও এড়ুমিশ্রের কারিকায় মহারাজা আদিশূরের উল্লেখ আছে, নগেন্দ্রনাথ বসু ইহা হইতে কয়েকটি শ্লোকও উদ্ধৃত করেন। বহু অর্থ ব্যয় করিয়া পূর্ববঙ্গ হইতে ঐ গ্রন্থ দুটির ফটো কপি আনাইয়া দেখা

যায় যে নগেনবাবুর উদ্ধৃত শ্লোকগুলি উহাতে নাই, সুতরাং আদিশূরের অস্তিত্বই অপ্রমাণিত হয়। প্রাচীন নানা কুলজী গ্রন্থগুলি নানা কল্পিত কাহিনীতে পূর্ণ, অনেকগুলি আবার জাল পুঁথি। জাতি বা ব্যক্তিবিশেষের পূর্বপুরুষের অলীক কীর্তি-কাহিনী লিখিয়া সেগুলি প্রাচীন পুঁথি বলিয়া চালানো হইত। নূতন পুঁথি লিখিয়া তাহার উপর অ্যাসিড ছড়াইয়া বালির নীচে কিছুকাল রাখিয়া দিলে তাহা প্রাচীন পুঁথি বলিয়া চালানো যায়, রমেশচন্দ্র অনুসন্ধানে এই তথ্য জানিতে পারেন। কুলজী গ্রন্থগুলি যে আদৌ ইতিহাসভিত্তিক নহে, স্বার্থপ্রণোদিত রচনা এইগুলির উপর ভিত্তি করিয়া যে ইতিহাস রচিত হয় তাহা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না এ বিষয়ে সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য রমেশচন্দ্র 'ভারতবর্ষ' নামক অধুনালুপ্ত বিখ্যাত ও বহুপঠিত মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন (ভারতবর্ষ, ১৩৪৬, কার্তিক—ফাল্গুন)। এই প্রবন্ধগুলি পরে পুস্তকাকারে 'বঙ্গীয় কুলশাস্ত্র' নামে প্রকাশিত হয় (৪১)। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত 'বসু ইনস্টিটিউট' নামক বৈজ্ঞানিক সংস্থার আহ্বানে আচার্যদেবের স্মৃতি উদ্দেশ্যে প্রাচীন ভারতে বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির বিকাশ সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র কয়েকটি ভাষণ দান করেন। অনেকেরই ধারণা আছে যে প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানের কোন চর্চা হইত না। ইউরোপীয় পণ্ডিতরা বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্বন্ধে যে সব গ্রন্থ লেখেন তাতে প্রাচীন মিশর, ব্যাবিলন, গ্রীস ও রোমে বিজ্ঞান-চর্চার উল্লেখ থাকে কিন্তু প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চার কোন উল্লেখ এই সব গ্রন্থে দেখা যায় না। বহুকাল পূর্বে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এ বিষয়ে ইংরাজীতে একটি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন কিন্তু এই গ্রন্থটি বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়াছে। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ রমেশচন্দ্রের ইংরাজী ভাষণটি প্রকাশিত হওয়ার পর এই ভাষণটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশের ইচ্ছা প্রকাশ করায় রমেশচন্দ্র এ সম্বন্ধে আরও একটু বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়া একখানি পুস্তক রচনা করেন। ইহাতে সংস্কৃতে লিখিত প্রাচীন শাস্ত্র ও সাহিত্যের সাক্ষ্য উদ্ধার করিয়া রমেশচন্দ্র প্রাচীন হিন্দুগণের বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি ও বিজ্ঞান-চর্চার ইতিহাস ব্যক্ত করেন। জ্যোতিষ, জ্যামিতি, পাটীগণিত, বীজগণিত, আয়ুর্বেদ, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে প্রাচীন হিন্দুর দক্ষতার আলোচনা করিয়া রমেশচন্দ্র মন্তব্য করেন যে বর্তমানে বিজ্ঞানের অগ্রগতির বিষয়ে পাশ্চাত্য-জগৎ সর্বতোভাবে হিন্দুজাতির নিকট ঋণী। রমেশচন্দ্রের পূর্বে কেহই এ বিষয়ে বাংলা ভাষায় আলোচনা করেন নাই। রমেশচন্দ্রের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া এখন অনেক বৈজ্ঞানিক বাংলাভাষায় প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। রমেশচন্দ্রের এই নাতিদীর্ঘ অথচ বহু তথ্য সমৃদ্ধ গ্রন্থটি কবিগুরু প্রবর্তিত বিশ্বভারতীর বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহমালার অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয়।

১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র কলিকাতা বিদ্যালয়ে 'কমলা লেক্চারস্' প্রদানের জন্য আহূত হন। সার আশুতোষ তাঁহার বিধবা কন্যা কমলাদেবীর স্মৃতিরক্ষার্থে এই ভাষণমালার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। দেশ-বিদেশের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিতদেরই এই ভাষণমালা দানের জন্য আমন্ত্রণ করা হয়। ইতিপূর্বে খ্যাতনাম্নী বিদুষী ভারত-সেবিকা ডঃ অ্যানি বেশান্ত, রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত (প্রিন্সি কাউন্সিলার) শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা, শিক্ষাবিদ্ ডঃ আর পি পরাঞ্জপে, মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, স্বাধীন ব্রহ্মের রাষ্ট্রপ্রধান উ নু প্রভৃতি এই বক্তৃতা দানের জন্য আহূত হইয়াছিলেন।

এযাবৎ এই ভাষণমালা ইংরাজীতেই প্রদত্ত হইত। রমেশচন্দ্র সর্বপ্রথম বাংলায় এই ভাষণ দেন। এই ভাষণমালার বিষয়বস্তু ছিল 'মধ্যযুগে বাংলার সংস্কৃতি'। এই ভাষণমালা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ইহার পরও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে রমেশচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অশোকবিজয় ভট্টাচার্য স্মারক বক্তৃতা দিতে আহূত হন। তাঁহার বিদ্যাসাগর বক্তৃতামালার বিষয়বস্তু ছিল—বাংলা গদ্যের সূচনা ও নারী প্রগতি (৪৪)। রমেশচন্দ্রের অশোক ভট্টাচার্য বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল 'হিন্দু-সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ' (৪৫)। রমেশচন্দ্র কয়েকটি ছাত্র পাঠ্য পুস্তক ইংরাজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই রচনা করেন। 'ইতিহাস' নামক একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকায় রমেশচন্দ্র তাঁহার স্মৃতিকথা লিখিয়া প্রকাশ করেন (২য় খণ্ড ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ)। পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ইহার অবশিষ্টাংশ তিনি সম্পূর্ণ করিয়া জীবনের স্মৃতি দীপে নামে প্রকাশ করেন। অবশ্য এই পুস্তকটি তিনি স্বহস্তে রচনা করেন নাই। একজন অনুলেখকের সাহায্যে ইহা লিপিবদ্ধ হয়।

সাধারণতঃ দেখা যায় কোন একজন ঐতিহাসিক তাঁর সাধনাকে বিশেষ একটি যুগ বা বিষয়ে সীমাবদ্ধ রাখেন এবং নিজক্ষেত্রে তিনি নিজেকে একজন বিশেষজ্ঞ রূপে প্রতিপন্ন করিয়া খ্যাতিলাভ করেন। রমেশচন্দ্র ইতিহাস সাধনাক্ষেত্রে এক বিরল ব্যতিক্রম। তাঁহার ইতিহাস যুগ হইতে যুগান্তরে, এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে এমন কি ভারতের ভৌগোলিক সীমানা ছাড়াইয়া বৃহত্তর বা বৃহত্তম ভারত পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল। ভারতের বৈদিক পূর্ব যুগ, বৈদিক যুগ ও মধ্য যুগের ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে লিপিবদ্ধ করিয়া ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর কালসীমা অবধি রমেশচন্দ্রের গবেষণার খ্যাতি ছিল। রমেশচন্দ্রের প্রায় ৫০টি গ্রন্থ ও তিন শতাধিক প্রবন্ধের মধ্যে তথ্যের প্রাচুর্য ও এই তথ্যগুলির বিচার বিশ্লেষণ এবং এইগুলির যথাযথ উপস্থাপন যে কোন ইতিহাস অনুসন্ধিৎসু ও ইতিহাস-রসিকের সপ্রশংস বিস্ময় আকৃষ্ট করার পক্ষে পর্যাপ্ত। রমেশচন্দ্রের গ্রন্থগুলি নানা বিষয়ে তাঁহার গভীর জ্ঞান, প্রখর স্মৃতিশক্তি ও অসাধারণ অধ্যবসায়ের পরিচায়ক। সত্যানুসন্ধানের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া রমেশচন্দ্র প্রামাণিক তথ্যের সাহায্যে যে সিদ্ধান্তকে যথার্থ বলিয়া মনে করিতেন তাহাই তিনি লিপিবদ্ধ করিতেন। তিনি বিশেষ মতবাদের প্রতিষ্ঠার জন্য কখনও লেখনী ধারণ করেন নাই। অপ্রিয় সত্য ভাষণে তিনি কখনও কুণ্ঠিত হন নাই। ইতিহাস-নিন্দিত বহু পুরুষকে তথ্য-প্রমাণ সহকারে তিনি কলঙ্কমুক্ত করিয়াছেন। আবার ইতিহাস-বন্দিতবহু পুরুষের দোষ-ত্রুটিগুলি উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন। বর্তমানকালে সাধারণভাবে ঐতিহাসিকেরা ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চান যে মুসলমান শাসনকালে হিন্দু-মুসলমান শান্তিতে বাস করিত, সাম্প্রদায়িকতা অল্পই লক্ষিত হইত হইত। রমেশচন্দ্র ইহাদের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র দেখাইয়াছেন মুসলিম শাসকগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হিন্দু প্রজাদের আস্থা অর্জন করিতে পারেন নাই, কারণ তাঁহারা কোরাণ-হদিস অনুযায়ী রাজ্যশাসন করিতেন। এই শাসননীতির মধ্যেই ভবিষ্যতে পাকিস্তান-সৃষ্টির বীজ নিহীত হইয়া গিয়াছিল। ৭০০ বৎসর একত্র বাসের ফলেও হিন্দু-মুসলমান একটি মিলিত সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিতে ব্যর্থ হইয়াছিল। আহার, পোষাক-পরিচ্ছদ এবং রাজকীয় আদব কায়দার মত কতক গুলি বিষয়ে হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের কাছাকাছি আসিয়াছিল তবে এগুলি সবই ছিল বাহ্য বিষয়। বাংলা

প্রদেশেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূচনা হয়। রমেশচন্দ্রের মতে পলাশীর যুদ্ধে বাঙালীর পরাজয়ের বহু পূর্ব হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বিশ্বাসঘাতক প্রবণতা, মিথ্যাচার, নিষ্ঠুরতা, ধূর্ততা, স্বার্থপরতা, বিলাস-প্রবণতা ও ইন্দ্রিয়াসক্তি বাঙালী-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হইয়া উঠিয়াছিল। চতুর ইংরাজ এই পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। পলাশীর যুদ্ধ ছিল একটি উপলক্ষ্য মাত্র, ইহা একটি অপ্রত্যাশিত ও অসম্ভাব্য ব্যাপার ছিল না। রমেশচন্দ্র কখনও সার যদুনাথের প্রত্যক্ষ ছাত্র ছিলেন না তথাপি তিনি যদুনাথকে গুরুর মত মান্য করিতেন। ১৩২১ বঙ্গাব্দে বর্ধমান সাহিত্য সম্মেলনের ইতিহাস শাখার সভাপতির ভাষণে সার যদুনাথ নিম্নলিখিতভাবে ঐতিহাসিকদের পথনির্দেশ করেন—"সত্য প্রিয়ই হউক ও অপ্রিয়ই হউক সাধারণের গৃহীত হউক বা না হউক তাহা ভাবি না। আমার স্বদেশ গৌরবকে আঘাত করুক বা না করুক, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিব না। সত্য প্রচার করিবার জন্য সমাজে বা বন্ধুবর্গের মধ্যে গঞ্জনা সহিতে হয় সহিব। কিন্তু এই সত্যকে খুঁজিব, বুঝিব, গ্রহণ করিব। ইহাই ঐতিহাসিকের প্রতিজ্ঞা।" রমেশচন্দ্র ইতিহাসাচার্য যদুনাথের এই পথনির্দেশ আজীবন অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া গিয়াছেন। ইতিহাস সাধনার মাধ্যমে সত্যের প্রতিষ্ঠায় রমেশচন্দ্র জীবন পাত করিয়া গিয়াছেন। সত্য প্রতিষ্ঠার সাধনায় জীবনে তাঁহাকে বহু ক্ষতির সম্মুখীন হইতে হইয়াছে কিন্তু এই ক্ষতির বোঝা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি প্রসন্ন মনে বহন করিয়া গিয়াছেন।

অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও ইতিহাস রচনা রমেশচন্দ্রের জীবনের মুখ্য লক্ষ্য ছিল, এতৎসত্ত্বেও তিনি নিজেকে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন রাখেন নাই। সমাজের প্রতি প্রতিটি মানুষের যে একটি দায়িত্ব আছে, রমেশচন্দ্র এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন ও এই দায়িত্ব পালনে তিনি আজীবন তৎপর ছিলেন। ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার কালে তাঁহার ভূমিকা ইতিপূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির নব-সৃষ্ট পূর্ব-পাকিস্তান হইতে নির্যাতীত, বিতাড়িত ও ভীত নরনারী দলে দলে পশ্চিম বাংলায় আসিতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গ বা ভারত সরকার উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তাহা অপর্যাপ্ত ছিল, যাঁহাদের উপর সরকারী ব্যবস্থা কার্যকর করার দায়িত্ব ছিল—এই দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা তাঁহাদের ছিল না; সরকারী ব্যবস্থার মধ্যে বহু ত্রুটি ও শৈথিল্য ছিল। বে-সরকারী স্তরে যাঁহারা এ বিষয়ে উদ্বাস্তু পরিত্রাণে আত্মনিয়োগ করেন তাঁহাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ডঃ মেঘনাদ সাহা, দেশ ও সমাজসেবিকা শ্রীমতী লীলা রায়, শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে রমেশচন্দ্রের নামও উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ কলিকাতায় লেকে (অধুনা রবীন্দ্র সরোবর) আমেরিকান সৈন্যদের পরিত্যক্ত অনেকগুলি টালি ও ইট নির্মিত বাড়ী ছিল। রমেশচন্দ্র ও তাঁর সহযোগীগণ বাস্তুহারাদের ঐ সব বাড়ীতে আশ্রয়ের ব্যবস্থার জন্য পশ্চিম বাংলার প্রথম প্রধান মন্ত্রী (তখন এই নাম ছিল) ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের অনুমোদন প্রার্থনা করেন। ডঃ ঘোষ এই প্রার্থনা মঞ্জুর করেন নাই, তিনি যুক্তি দেন যে হিন্দুরা পূর্ববঙ্গ ছাড়িয়া আসিবে—ইহার প্রশ্রয় দান সরকারী নীতি নহে। রমেশচন্দ্র ডঃ ঘোষকে সরকারী নীতি অপেক্ষা বাস্তব ঘটনার দিকে লক্ষ্য রাখার উপদেশ দেন। এই ব্যাপারটি ডঃ ঘোষ মন্ত্রীসভার তদানীন্তন অর্থমন্ত্রীর সহিত আলোচনার সময় রমেশচন্দ্র তাঁর স্বজেলা ফরিদপুরের সন্তান এই মন্ত্রীকে বলেন যে, পূর্ববাংলার যে সব জেলার সত্তর ভাগ মুসলমান সেখানে যদি হিন্দু নির্যাতন বন্ধ না হয় তবে কয়েক বৎসরের মধ্যে ত্রিশ ভাগ হিন্দু মুসলমান ধর্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে মন্ত্রীবর অম্লান

বদনে উত্তর দিয়াছিলেন—হয় হবে। রমেশচন্দ্র এই উত্তরে মর্মাহত হন। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে বাস্তুহারাদের দুর্দশা ও পুনর্বাসন সম্বন্ধে বহু অভিযোগ পাইয়া প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু নিজে 'সরেজমিনে' এ বিষয়ে তদন্ত করার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আসেন। রমেশচন্দ্র তাঁহাদের সমিতির অন্য দু' একজনের সঙ্গে ১৪ই জুলাই পণ্ডিত নেহেরুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উদ্বাস্তু পরিত্রাণের জন্য নিযুক্ত সরকারী তত্ত্বাবধায়কদের অকর্মণ্যতা, হৃদয়হীনতা ও তথা শৈথিল্যের বিষয়ে বহু অভিযোগ করেন। রমেশচন্দ্রকে তাঁহাদের বক্তব্য বলার জন্য ১৫ মিনিট সময় দেওয়া হইয়াছিল। বক্তব্য শেষ হওয়ার পূর্বেই পনের মিনিট অতিক্রান্ত হইলে নেহেরুজীর ব্যক্তিগত সচিব রমেশচন্দ্র সহ প্রতিনিধি দলকে চলিয়া যাইতে বলেন। পণ্ডিত নেহেরু ইহাতে বাধা দিয়া বলেন যে, ইহাদের নিকট আমাকে আরও অনেক কিছু জানিয়া লইতে হইবে। অতঃপর দীর্ঘ সময় ধরিয়া পণ্ডিতজী ইহাদের বক্তব্য শ্রবণ করেন ও এই অভিযোগগুলি লিখিতভাবে তাঁহাকে পাঠাইতে বলেন।

পূর্ব পাকিস্তান হইতে হিন্দু বিতাড়ন নীতি কখনও তীব্র কখনও বা ঈষৎ তীব্র আকারে বাংলাদেশ সৃষ্টি পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। একবার, দুইবার নয় বহুবার পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু নির্যাতন ও হিন্দু বিতাড়ন কাজের বিরুদ্ধে ভারত সরকার চিঠিতে প্রতিবাদ জানান ছাড়া আর কিছুই করেন নাই, পশ্চিমবঙ্গ সরকারও সেই নীতির অনুকরণ ও অনুসরণ করিয়াছেন—রমেশচন্দ্র এই অভিমত পোষণ করিতেন। রমেশচন্দ্রের অভিমত এই ছিল যে, হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে লোক বিনিময় ব্যতীত পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান অসম্ভব। পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদে যে সব জনসভা হইত রমেশচন্দ্র সেই সব সভায় উপস্থিত থাকিয়া বক্তৃতা দিতেন কখনও ঐ সভায় সভাপতিত্বও করিতেন। এই রূপ দু' একটি সভায় আচার্য কৃপালিনী ও জয়প্রকাশ নারায়ণ ভাষণ দান করেন—রমেশচন্দ্র এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাংলাদেশের সপক্ষে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ চলাকালে রমেশচন্দ্র সংবাদপত্র মারফৎ এই রূপ একটি প্রস্তাব করেন যে বাংলাদেশ এখন ভারতের সাহায্যপ্রার্থী ও ভারতের উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশ-পাকিস্তান সংঘর্ষের ফলে এক লক্ষেরও অধিক হিন্দু শরণার্থী পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় লইয়াছে। বাংলাদেশ সীমান্তের খানিকটা অংশ কাটিয়া লইয়া তাহা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হউক এবং সেখানে শরণার্থী হিন্দুদের বসবাসের ব্যবস্থা করা হউক। রমেশচন্দ্রের এই প্রস্তাবটি কোন বাঙালী রাজনীতিক এমন কি তাঁহার পরিচিত ভূতপূর্ব বিপ্লবীরাও সমর্থন করেন নাই। রমেশচন্দ্রের ভাষায় তখন তারা সকলেই মনে এই আশা পোষণ করেছেন যে, এইবার বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের যে মিলন হল তা 'যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ' অর্থাৎ যতদিন চন্দ্র-সূর্য থাকবে ততদিন বজায় থাকবে। রমেশচন্দ্র ইহাদের পাঁচ-সাত বৎসর অপেক্ষা করিতে বলেন। রমেশচন্দ্র তাঁর ইতিহাস-সচেতন প্রজ্ঞার বলে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে মুজিবুর রহমান যতই চেষ্টা করুন, এবং সংবিধানে সাম্প্রদায়িক ভেদ বিলোপ করে এক জাতীয়তার আদর্শ প্রচার করুন—হিন্দু-মুসলমান তুল্য অধিকার নিয়ে সুখে শান্তিতে বাস করতে পারবে এ আশা খুবই কম। রমেশচন্দ্র লিখিয়াছেন যে, বিপ্লবী ত্রৈলোক্য মহারাজের "জীবন-স্মৃতি" গ্রন্থে পূর্ববাংলার হিন্দুদের প্রতি মুসলমান সরকার ও সম্প্রদায়ের অত্যাচারের যে বিবরণ আছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, পূর্ববাংলার মুসলমানরাই এর জন্য দায়ী, বহিরাগত মুসলমানগণ নহে।" রমেশচন্দ্র "ইস্ট বেঙ্গল

মাইনরিটি ওয়েলফেয়ার কমিটির" অন্যতম সদস্য ছিলেন। এই কমিটির সদস্য রূপে তাঁহার এই অভিজ্ঞতা হয় যে উদ্বাস্তুদের জন্য বরাদ্দ সরকারী টাকা অন্ততঃ অর্ধেক (সম্ভবতঃ আরও অধিক) তাদের দুর্গতি দূর করার জন্য ব্যয় হয় নি, কর্মচারীরাই আত্মসাৎ করিয়াছে, প্রকৃত কাজের তাহারা উদাসীনতা দেখাইয়াছে। মনুষ্যত্বের দিক দিয়াও তাহাদের এই কার্যে উৎসাহ ও সহানুভূতির অভাব ছিল। এই প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্রের আর একটি অভিমত এই যে, পশ্চিমবঙ্গে আগত বাস্তুহারাদের চরিত্রবলের অভাব ছিল। দুর্দশা স্বীকার করিয়া নিজে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া সেই দুর্দশা হইতে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা খুব কমই ছিল। রমেশচন্দ্র আরও মন্তব্য করেন যে, পাঞ্জাবী উদ্বাস্তুরা বহু দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া নানা রকমে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইবার চেষ্টা করিয়াছে এবং মোটের উপর সেখানকার বাস্তুহারা সমস্যা অল্প সময়ের মধ্যেই মিটিয়া গিয়াছিল (দ্রঃ জীবনের স্মৃতিদীপে—পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারা)।

ভূতপূর্ব পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া একতরফাভাবে "বাংলাদেশ" নাম গ্রহণে রমেশচন্দ্র বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার মতে পূর্ব ও পশ্চিম মিলিয়া "বাংলাদেশ," শুধু পূর্ব বাংলার বাংলাদেশ নামটির উপর নৈতিক অধিকার থাকিতে পারে না। পূর্ববাংলার 'বাংলাদেশ' নাম গ্রহণের প্রতিবাদের কোন চেষ্টা হইলে তিনি তাহার সমর্থন করিতে প্রস্তুত ছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে উৎফুল্ল পশ্চিম বাংলার অধিকাংশ মানুষ পূর্ব বাংলার 'বাংলাদেশ' নাম গ্রহণে আপত্তি করেন নাই। যে দু' একজন প্রতিবাদ করিয়াছিলেন তাঁহাদের ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রীর শত্রু বলিয়া চিহ্নিত করায় তাঁহাদের ক্ষীণকণ্ঠ বাংলাদেশ-প্রেমীদের উচ্চ কলরোলে চাপা পড়িয়া যায়।

অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ও ইতিহাস রচনা ও সমাজ সেবার অবসরে রমেশচন্দ্র দেশ ও বিদেশের বহু বিশ্বৎ সংস্থার সহিত জড়িত থাকিয়া নানাভাবে এইসব সংস্থার পরিপুষ্টি ও অগ্রগতিতে সাহায্য করেন। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে মহারাষ্ট্র পুনে শহরে অলইণ্ডিয়া ওরিয়েন্টল কনফারেন্সের (নিখিল ভারত প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলন) প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অশীতিপর বৃদ্ধ সুবিখ্যাত পণ্ডিত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে অন্য কয়েকজন পণ্ডিত অধ্যাপকের সঙ্গে রমেশচন্দ্র এই অধিবেশনে যোগদান করেন। ১৯১১ হইতে দুই বৎসর অন্তর এই সংস্থার অধিবেশন ভারতের নানা স্থানে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে ত্রিবেন্দ্রম শহরে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে রমেশচন্দ্র 'ইতিহাস' শাখার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে তিনি তিরুপতিতে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের দশম অধিবেশনে পুরাতত্ত্ব শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে বারভাঙ্গায় অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের চতুর্দশ অধিবেশনে রমেশচন্দ্র মূল সভাপতি পদে বৃত হন। ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্রী কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনে রমেশচন্দ্র সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে রমেশচন্দ্র ভারত সরকারের অন্যতম প্রতিনিধিরূপে 'ইউনাইটেড নেশনস এডুকেশন্যাল সাইন্টিফিক য়্যাণ্ড কালচারাল অর্গানেসনের (সংক্ষেপে ইউনেস্কো) ফোরেন্স অধিবেশনে যোগদান করেন, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে রমেশচন্দ্র ভারতের অন্যতম প্রতিনিধিরূপে তৃতীয় দেশের কলষ্টান্টিনোপল (বর্তমান নাম ইস্তাম্বুল) শহরে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অফ্ ওরিয়েন্টেলিস্টস এর ২৩তম অধিবেশনে যোগদান করেন। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সুষ্ঠুভাবে পাশ্চাত্য প্রাচ্য-বিদ্যা

বিশারদদের চেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠানটি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে কয়েক বৎসরের ব্যবধানে ইহার অধিবেশন হয়। এই আত্মমর্যাদাসম্পন্ন অধিবেশনে শুধু অতিবিশিষ্ট প্রাচ্যবিদ্যা-বিশারদদের যোগদানের অধিকার থাকে। রমেশচন্দ্র শুধু এই অধিবেশনে নিয়ন্ত্রিত হইয়া যোগদান করেন নাই। বহু শাখায় বিভক্ত এই সম্মেলনে রমেশচন্দ্র 'ভারত-বিদ্যা' (ইণ্ডোলজী) শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন, ইহা একটি দুর্লভ সম্মান। রমেশচন্দ্র এই বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী সমিতির সদস্যও নির্বাচিত হন। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রমেশচন্দ্রের খ্যাতি ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মধ্যে বিস্তৃত হয়। অতঃপর রমেশচন্দ্র অপর একটি আন্তর্জাতিক বিদ্বৎসংস্থা ব্যুরো অফ্ দি ইণ্টারন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ফিলসফি য়্যাণ্ড হিউম্যানিস্টীক ষ্টাডিজ সংস্থার সভ্য নির্বাচিত হন। রমেশচন্দ্র ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে প্যারিস শহরে অনুষ্ঠিত এই কাউন্সিল এর দ্বিতীয় অধিবেশনে যোগদান করেন।

রমেশচন্দ্র জীবনে বহু সম্মানে ভূষিত হন। তিনি কলিকাতা লণ্ডন ও বোম্বাই এসিয়াটিক সোসাইটির সম্মানিত ফেলো ও পুণে ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইন্সটিটিউট্ এর বিশিষ্ট সদস্য পদ লাভ করেন। ১৯৬৬-৬৮ খ্রীষ্টাব্দের জন্য তিনি কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৬৬ হইতে ১৯৬৯ পর্যন্ত তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় কৃতিত্বের জন্য কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁহাকে স্যার উইলিয়ম জোন্সও বিমলাচরণ লাহা স্বর্ণপদক এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্ম শতবার্ষিকী ফলক দানে সম্মানিত করেন (১৯২৫, ১৯৫৩, ১৯৭২) বোম্বাই এর এশিয়াটিক সোসাইটির 'ক্যাম্পবেল স্বর্ণপদক' ও তাঁহাকে প্রদত্ত হয়। কলিকাতা (১৯৬৯) যাদবপুর (১৯৬৯) ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি সম্মানসূচক ডি লিট্ উপাধি লাভ করেন। ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বভারতী (শান্তিনিকেতন) রমেশচন্দ্রকে এই প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ সম্মান 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত করেন। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ ও নব নালন্দা মহাবিহার কর্তৃক তিনি যথাক্রমে ভারততত্ত্ব ভাস্কর (১৯৬৫) ও বিদ্যাবারিধি উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন। প্রমুখ নাগরিক হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রমেশচন্দ্রকে কলিকাতা মহানগরীর শেরিফ নিযুক্ত করেন (১৯৬৭-৬৮)।

রমেশচন্দ্র অতিশয় ছাত্রবৎসল ছিলেন। তাঁহার বহু ছাত্রকে ইতিহাস গবেষণায় অনুপ্রাণিত করিয়া তিনি তাঁহাদের ঐতিহাসিক রূপে জীবন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার ছাত্র ছিলেন না, এমন বহু তরুণকে তিনি ইতিহাস সাধনা তথা বিদ্যা-চর্চায় অনুপ্রেরণা দান করেন। সদা কর্মব্যস্ত কর্মযোগী রমেশচন্দ্র ইহাদের সাহায্য দান সময়ের অপব্যয় মনে করিতেন না। ইহা তাঁহার কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন। রমেশচন্দ্রের গুণমুগ্ধ ছাত্র ও সহকর্মীগণ রমেশচন্দ্রের ৮২ তম জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁহার নামে একটি সম্বর্দ্ধনা গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থটিতে দেশীয় ও বিদেশীয় খ্যাতনামা পণ্ডিতদের লিখিত ভারত বিদ্যাবিষয়ক ১৯টি প্রবন্ধ আর্ট প্লেটে মুদ্রিত বহু চিত্র সহ প্রকাশিত হয় গ্রন্থের প্রথমে রমেশচন্দ্রের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী ও শেষে তাঁহার একটি সংক্ষিপ্ত রচনাপঞ্জী প্রকাশিত হয়। তাঁহার এক পুরাতন ছাত্র অধ্যাপক হিমাংশুভূষণ সরকার ইহা সম্পাদন করেন।

আর এক ভূতপূর্ব ছাত্র খ্যাতনামা পুস্তকব্যবসায়ী ও প্রকাশক কানাইলাল মুখোপাধ্যায় ইহা স্বব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করেন (আর-সি-মজুমদার ফেলিসিটেশন্ ভল্যুম—এডিটেড বাই এইচ বি সরকার—পাব্লিশড বাই—ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়, ১৯৬৯-৭০)।

গৌরকান্তি, সৌম্যদর্শন রমেশচন্দ্র সংযত স্বভাব, মিতাহারী ও মিতাচারী ছিলেন। তাঁহার এই স্বভাব তাঁহাকে অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী করিয়াছিল। সুস্বাস্থ্য তাঁহাকে সুখে দুঃখে অচঞ্চল রাখিতে সাহায্য করিত। যৌবনে তিনি নিয়মিত ব্যায়াম ও খেলাধূলায় অভ্যস্ত ছিলেন। প্রৌঢ়ত্বে পৌছিয়া তিনি প্রাতঃ ও সান্ধ্য ভ্রমণে অভ্যস্ত হন। পরিচিত বন্ধুদের কেহ-কেহ তাঁহার ভ্রমণ সঙ্গী হইতেন। তিনি যেমন ছাত্রবৎসল ছিলেন তেমনই ছিলেন বন্ধুবৎসল। শেষ জীবনে প্রকাশিত 'জীবনের স্মৃতিদীপে' গ্রন্থে মানুষ রমেশচন্দ্রের পরিচয় পাওয়া যায়।

রমেশচন্দ্রের একটি পুত্র ও তিনটি কন্যা ছিল। পুত্র অশোককুমারও ইতিহাসের কৃতবিদ্য ছাত্র ছিলেন। 'ডক্টর' উপাধি পাওয়ার পর অশোককুমার পিতার ইচ্ছায় বোম্বাইস্থিত ভারতীয় বিদ্যাভবনের যুগ্ম পরিচালক (জয়েণ্ট ডিরেক্টরে) এবং স্নাতকোত্তর গবেষণা শাখার বিভাগীয় প্রধান পদে কাজ করিতেন। হিস্ট্রি য়্যাণ্ড কালচার অফ্ দি ইণ্ডিয়ান পীপল' গ্রন্থমালা পরিকল্পনার প্রথম দিনে মুন্সীজী ডঃ এ. ডি. পুসলকরকে রমেশচন্দ্রের সহকারী নিযুক্ত করেন। অন্যত্র কর্মব্যস্ত রমেশচন্দ্রের নির্দেশমত পুসলকার বোম্বাই বিদ্যাভবনে গ্রন্থমালা প্রকাশের কাজ দেখাশুনা করিতেন। পুসলকার গ্রন্থমালার ৫টি খণ্ড প্রকাশে সাহায্য করেন। বাকী ছয়খণ্ড অশোককুমারের সহযোগিতা বা সহ সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছিল। অবসর গ্রহণের পর নিঃসন্তান অশোককুমার শান্তিনিকেতনে বাস করিতেন। দুঃখের বিষয় পিতার মৃত্যুর অল্পদিনের মধ্যেই অশোককুমারের মৃত্যু হয়।

রমেশচন্দ্রের সুযোগ্যা সহধর্মিনী প্রিয়বালা দেবী ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা শান্তি ও কনিষ্ঠা সুজাতাও পরলোক গমন করেন। রমেশচন্দ্র তাঁহার দুই অগ্রজকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রকাশচন্দ্র প্রথম জীবনে শিক্ষকতা করিতেন পরে কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট রূপে খ্যাতি লাভ করেন। প্রকাশচন্দ্র ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে পরলোক গমন করেন। মধ্যমাগ্রজ সতীশচন্দ্র গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী লাভ করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চীফ ইঞ্জিনীয়ার পদে কাজ করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সতীশচন্দ্র পরলোক গমন করেন। অগ্রজ দ্বয়, প্রিয়তমা পত্নী ও প্রাণাধিকা দুই কন্যার মৃত্যুতে রমেশচন্দ্র ভাঙ্গিয়া পড়েন নাই। শেষ জীবনে কি গুরুভার শোক তিনি বহন করিতেন তাহা কেহ জানিতে পারিত না। রমেশচন্দ্র অচঞ্চল থাকিয়া তাঁহার আরব্ধ কর্মগুলি নিয়মিত করিয়া যাইতেন। সামাজিক দায়দায়িত্বগুলিও যথারীতি পালন করিয়া যাইতেন। ১৯৭৯ নভেম্বর মাসে রমেশচন্দ্রের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। দক্ষিণ কলিকাতার ৪নং বিপিন পাল রোডস্থিত নিজ বাড়ীতে তিনি একাই বাস করিতেন, কারণ তাঁহার বিশাল লাইব্রেরীর সান্নিধ্য ত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। নভেম্বর মাসে স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ার জন্য একমাত্র জীবিত কন্যা সুমিত্রা চৌধুরী তাঁহাকে নিজের নিউ আলিপুরস্থ ভবনে সেবাশুশ্রূষা ও চিকিৎসার জন্য লইয়া যান। কন্যাগৃহে তাঁহার পরিচর্যার লোকের অভাব ছিল না। অল্পদিনের মধ্যেই কন্যার সেবাযত্নে রমেশচন্দ্রের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। ডিসেম্বরের

দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত এই উন্নতি অব্যাহত থাকে, এই সময় তিনি চলাফেরার সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়াও শুরু করেন। আরব্ধ 'লেসন্‌স অফ্ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্রী' গ্রন্থটি আবার লিখিতে শুরু করেন। কিন্তু কিছুদিন পর তিনি নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন। নিউমোনিয়ার উপক্রম হওয়ার পর তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন, শেষ পর্যন্ত এই হৃদরোগেই ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১১ ফেব্রুয়ারী সোমবার সকাল ৬-৩০ ঘটিকায় তিনি পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে রমেশচন্দ্রের বয়স ছিল ৯১ বৎসর ২ মাস। উনবিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণকারী বিরাট পুরুষদের শেষতম প্রতিনিধি রমেশচন্দ্রের মৃত্যুতে সমগ্র দেশে শোকের ছায়াপাত হয়। তাঁহার মৃত্যুতে বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়, তাহা পূর্ণ হইবার নহে।

---

(১) কর্পোরেট লাইফ ইন এনসিয়ান্ট ইণ্ডিয়া—কলিকাতা, ১৯১৮ ২য় পরিমার্জিত সং, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২২, ৩য় সং ১৯৬৩ ; (২) আর্লি হিস্ট্রি অফ্ বেঙ্গল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বুলেটিন ৩, ঢাকা ১৯২৫ ; (৩) আউট লাইন অব এনসিয়েন্ট ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি য়্যাণ্ড সিভিলিজেসন ; (৪) এনসিয়েন্ট ইণ্ডিয়া, বারাণসী, ১৯২৭, ১৯৫২ ৫ম সং, ১৯৭৭ ; (৫) চম্পা, লাহোর, ১৯২৭, (৬) এনসিয়েন্ট কলোনী ইন ফার ইস্ট—(১ম খণ্ড) চম্পা, ২য় খণ্ড, সুবর্ণদ্বীপ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস—দুই ভাগে বিভক্ত) ঢাকা, ১৯৩৮, (৭) এনসিয়েন্ট ইণ্ডিয়ান কলোনিজেসন ইন ইস্ট এশিয়া বরোদা, ১৯৫৫, (৮) হিন্দু কলোনীজ ইন দি ফার ইস্ট, কলিকাতা; ১৯৪৪ ২য় সং, ১৯৬৩ ৪র্থ সং ১৯৭৪ ; (৯) ইন্সক্রিপসন্‌স অফ কম্বুজ—এশিয়াটিক সোসাইটি ৪র্থ সং, ১৯৭৪, কলিকাতা, (মনোগ্রাফ), ১৯৫৩ ; (১০) কম্বুজদেশ—অর য়্যানএনসিয়েন্ট হিন্দু কলোনী ইন কম্বোডিয়া, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাজ, ১৯৪৪, (১১) গ্রেটার ইণ্ডিয়া, লাহোর ১৯৪১ ; (১২) হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ১ম খণ্ড—হিন্দুযুগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৩ ; (১৩) হিস্ট্রি অফ এনসিয়েন্ট বেঙ্গল—কলিকাতা, ১৯৭১, হিস্ট্রি অফ মিডিভ্যাল বেঙ্গল, কলিকাতা, ১৯৭৪ ; হিস্ট্রি অফ মডার্ণ বেঙ্গল (২য় ভাগ), কলিকাতা, ১৯৭৮ ; (১৪) দি বাকটক গুপ্ত এজ (আ: ২৭০—৫৫০ খ্রীস্টাব্দ)—এ এস্ আল্‌টেকারের সহযোগিতায়, (এ নিউ হিস্ট্রি অফ দি ইণ্ডিয়ান পীপল সিরিজের ষষ্ঠ খণ্ড), লাহোর ১৯৪৬, ২য় সং বারাণসী, ১৯৫৪ (ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস কর্তৃক প্রকাশিত (১৫) সিপাই মিউটিনি য়্যাণ্ড রিভোল্ট অফ এইটিন সেভেন্টি সেভেন, কলিকাতা, ১৯৫৭, ৩য় সং ১৯৬০ ; (১৬) হিস্টি অফ দি ফ্রিডম মুভমেন্ট ইন ইণ্ডিয়া, ১৪ খণ্ড, কলিকাতা ১৯৬২, ২য় সং ১৯৭১ ; ২য় খণ্ড কলিকাতা ১৯৬৩, ২য় সং ১৯৭৪ য় খণ্ড ১৯৬৭, কলিকাতা, ২য় সং ১৯৭৬ ; (১৭) দি হিষ্ট্রী য়্যাণ্ড কাল্‌চার অফ দি ইণ্ডিয়ান পীপল—১ম খণ্ড বৈদিকযুগ ১৯৫১, ২য় সাম্রাজ্যের যুগ (দি এজ অফ ইম্পিরিয়াল ইউনিটি) ২য় সং—বোম্বাই, ৯৫৩ ; ৩য় খণ্ড—ক্লাসিক্যাল এজ ১৯৫৪, ১৯৬২ ৪র্থ খণ্ড—কনৌজ সাম্রাজ্য যুগ, ১৯ ৫ ; ৫ম খণ্ড—সাম্রাজ্য স্থাপনের সংগ্রাম, ১৯৫৭, ৬ষ্ঠ খণ্ড—দিল্লী সুলতানদের যুগ, ১৯৬০; ৭ম খণ্ড—মুঘল যুগ, ১৯৭৪, ৮ম খণ্ড—মারাঠা প্রাধান্য ও মারাঠা সাম্রাজ্যের কাল, ১৯৭৭ ; ৯ম ব্রিটিশের আধিপত্য স্থাপন,—১৯৭১ ১০ম—ভারতের নব জাগরণ (১৮১৮—১৯০৫) ১১ খণ্ড—স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৯৬৯ সব কয়টি খণ্ডই বোম্বাইর ভারতীয় বিদ্যাভবন কর্তৃক প্রকাশিত, অনেকগুলি খণ্ড ইতিমধ্যে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

(১৮) মহারাজা রাজবল্লভ—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা ১৯৪৪, ৪৭ ; (১৯) দি এডভান্সড্ হিষ্ট্রী অফ ইণ্ডিয়া ম্যাকমিলন এণ্ড কোং লণ্ডন, ১৯৪৬, ৪র্থ সং ১৯৮২ ; (২০) ক্লাসিক্যাল একাউন্টস্ অব ইণ্ডিয়া—কলিকাতা, ১৯৬০ ; (২১) গ্লিম্পসেস্ অফ বেঙ্গল ইন দি নাইনটিনথ সেঞ্চুরী, কলিকাতা ১৯৬০ ; (২২) ইণ্ডিয়ান রিলিজন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা ১৯৬১ ; (২৩) সোয়ামী বিবেকানন্দ সেন্টিনারী ভল্যুম-(সং) বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কমিটি, কলিকাতা ১৯৬৩ ; (২৪) সোয়ামী বিবেকানন্দ—এ হিস্টরোকিক্যাল রিভিউ, কলিকাতা ১৯৬৫ ; (২৫) দি রেনাসেন্ট—ইণ্ডিয়া কলিকাতা, ১৯৭৬ ; (২৬) ইনফ্লুয়েন্স অফ ইণ্ডিয়ান কালচার ইন সাউথ ঈষ্ট এশিয়া ; আমেদাবাদ ১৯৬৯ (২) হিষ্ট্রী অফ্ হিন্দু কলোনীজেসন য়্যাণ্ড হিন্দু কালচার, জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়—১৯৭০ ; (২৮) এনসিয়েন্ট ইণ্ডিয়ান কলোনিজেশন ইন সাউথ ঈস্ট এসিয়া, সয়াজীরাও গায়কোয়াড় বক্তৃতা, বরোদা ১৯৭১ ; (২৯) ষ্টাডি অফ স্যান্সক্রিট ইন সাউথ ঈষ্ট এশিয়া (কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ সিরিজ, ১ ২ সংখ্যা ১৯৭৪ ; (৩০) থি্ ফেসেজ্ অফ ইণ্ডিয়াস্ ষ্ট্রাগল ফর ফ্রীডম (বিড়লা এনডাউমেন্ট লেকচারস্) বোম্বাই ১৯৬৭ ; (৩১) এক্সপ্যানসান অফ্ এরিয়ান কালচার ইন ঈষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া, ইম্ফল, মণিপুর—১৯৬৮ ; (৩২) ব্রিটিশ ইম্প্যাক্ট অন হিন্দু কাল্‌চার (কেরল ইউনিভারসিটি), ১৯৭৩ ; (৩৩) অন রামমোহন রায়—বি বি মজুমদার লেকচারস্, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা, ১৯৭২ ; (৩৪) হিষ্ট্রীয়োগ্রাফি ইন মডার্ণ ইণ্ডিয়া, বোম্বে ১৯৭০ ; (৩৫) দি রিভল্যুসানারী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল য়্যাণ্ড দি রোল অব্ সূর্য সেন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৮ ; (৩৬) গ্রেট ওম্যান অফ ইণ্ডিয়া (সং) অদ্বৈত আশ্রম, আলমোড়া (উত্তর প্রদেশ) ১৯৫৩ ; (৩৭) কম্প্রিহেনসিভ্ হিষ্ট্রী অফ্ ইণ্ডিয়া, তৃতীয় খণ্ড, ১ম ও ২য় ভাগ (৩২০-৭৮৫ খ্রী:)—দিল্লী ১৯৮১-৮২।

সংস্কৃত

(৩৮) রামচরিত—সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত—বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি রাজশাহী, (বর্তমান বাংলাদেশ) ১৯৩৯ ; (৩৯) রাজবিজয় নাটক সম্পাদিত (কৃষ্ণগোবিন্দ গোস্বামীর সহায়তায়), ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইন্সটিটিউট, কলিকাতা, ১৯৪৭।

বাংলা

(৪০) বাংলাদেশের ইতিহাস—প্রচীন যুগ, ১ম খণ্ড কলিকাতা প্রথম সং ১৯৪৬,

,,	মধ্যযুগ	২য় খণ্ড,	১৯৬৬-৬৭
,,	আধুনিক	৩য় খণ্ড,	১৯৭৪-৭৫
,,	মুক্তি-সংগ্রাম	৪র্থ খণ্ড	১৯৭৪-৭৫

(৪১) বঙ্গীয় কুলশাস্ত্র—কলিকাতা,১৯৭০ ; (৪২) প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান-চর্চা—বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ ১২০, বিশ্বভারতী, কলিকাতা ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ; (৪৩) মধ্যযুগের বাংলার সংস্কৃতি—কমলা বক্তৃতামালা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৬ ; (৪৪) বিদ্যাসাগর : বাংলা গদ্যের সূচনা ও নারী-প্রগতি—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৩৭৬ (১৯৬৯-৭০) ; (৪৫) হিন্দু-সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৭ ; (৪৬) জীবনের স্মৃতিদীপে—কলিকাতা, ১৯ ৮।

প্রস্থানভেদ ॥ শ্রীমধুসূদন সরস্বতী কৃত। শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত সম্পাদিত। প্রকাশক সাহিত্যলোক। মূল্য পনেরো টাকা।

প্রস্থান শব্দটি সাধারণভাবে স্কুল বা সম্প্রদায় বোঝায়। শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন প্রস্থানে বাইরে মতভেদ যাই থাক না কেন, তাদের মূল প্রতিপাদ্য এক, এই কথাটিই প্রস্থানভেদ বইটিতে বলা হয়েছে। একে বই বলা হলেও এটি কিন্তু পৃথক বই নয়। একটি বড় এবং বিখ্যাত টীকার অংশ বিশেষ মাত্র। সংস্কৃত সাহিত্যে অগণিত স্তব-স্তুতির মধ্যে শিবমহিম্নঃস্তোত্রের মাহাত্ম্য সর্বত্র স্বীকৃত। মধুসূদন সরস্বতী এই অনবদ্য স্তোত্রটি শিব ও বিষ্ণু উভয়েরই স্তুতিরূপে ব্যাখ্যা করেছেন।

সংস্কৃত স্তোত্রগুলি অধিকাংশই কোনো পুরাণ বা তন্ত্র থেকে সংগৃহীত, কতকগুলি শঙ্করাচার্যের নামে প্রচলিত। বাকি লেখকেরা প্রায় পরিচয়হীন। যেমন বর্তমান স্তোত্রটি গন্ধর্ব পুষ্পদন্তের নামেই প্রসিদ্ধ। আচার্য মধুসূদন জন্মসূত্রে বাঙালী হলেও সুদীর্ঘ সন্ন্যাস-জীবন সম্ভবতঃ কাশীতেই যাপন করেন এবং সেখানে বোধকরি তাঁর জীবদ্দশাতেই সেই শ্লোকটি চালু হয় যে—"বিদ্যা যে কী বস্তু তা শুধু মধুসূদনই জানেন, আর তাঁর বিদ্যার পরিমাপ করা দেবী সরস্বতীরই সাধ্য।" জনশ্রুতি এই যে তিনি মহাকবি তুলসীদাসের সমসাময়িক এবং তাঁর কাব্যের রসগ্রাহী ছিলেন। বৈদান্তিক সমাজে আচার্য শঙ্করের পরেই মধুসূদনের স্থান। ব্যাসতীর্থের ন্যায়ামৃত অতি নিপুণভাবে খণ্ডন করে অদ্বৈতসিদ্ধির রচনা করে আবার তিনি সগৌরবে অদ্বৈতবেদান্তকে প্রতিষ্ঠিত করেন। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থেও আমরা তাঁকে অষ্টাদশ বিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা রূপেই দেখি। তাই প্রস্থানভেদ আর কিছু নয়, অষ্টাদশ বিদ্যার সংক্ষিপ্ত পরিচয় বা বিবরণ। শিবমহিম্নঃস্তোত্রের সপ্তম শ্লোকে 'প্রভিন্নে প্রস্থানে' এই শব্দ দুটি আছে—সেখানে বলা হয়েছে "রুচি অনুসারে মতের ভেদ ঘটে, কিন্তু সব নদীই যেমন সমুদ্রে মেশে তেমনি সব মতের লক্ষ্যও হে ঈশ্বর তুমিই।"

শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত মধুসূদনের এই প্রসিদ্ধ নিবন্ধটির বাঙলা অনুবাদ করে প্রচুর সারগর্ভ টীকা ও বিস্তৃত পরিশিষ্ট (পৃঃ ৪৬—পৃঃ ৮৮) দিয়ে অতি যত্নের সঙ্গে সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছেন। অনুবাদ আমাদের ভালো লেগেছে, এবং তা মূলের অনুবর্তীও বটে। পরিশিষ্টের গ্রন্থ-বিবরণটি সাধারণ পাঠকের জন্যে বহু যত্নে সঙ্কলিত। এই বিবরণীতে বৌদ্ধ-দর্শনের পৃথক উল্লেখ থাকলেও জৈন-দর্শনকে লোকায়ত-দর্শনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন কেন জানি না। যাই হোক এই বই প্রস্থানভেদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে বললে অত্যুক্তি হবে না, কারণ এতকাল যে এর কোনো ইংরেজী বা বাঙলা অনুবাদ নেই, তা নিয়ে আমাদের কোনো জিজ্ঞাসা আদৌ ছিল না। কোলব্রুক, বেবর, ম্যাক্সমূলার, পল ডয়সেন—প্রমুখ ধুরন্ধর পণ্ডিতেরা সকলেই যে প্রস্থানভেদকে ভারতীয় শাস্ত্র সমূহের বিবরণী হিসাবে সবিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন এবং কোলব্রুকই যে সে প্রস্থানভেদকে পাশ্চাত্য শিক্ষিত সমাজের গোচরে আনেন তা আমাদের মত অল্পবিদ্যা বহু ব্যক্তিরই জানা ছিল না।

প্রস্থানভেদের প্রাচীন পুঁথিও লেখক অন্বেষণ করেছেন। পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী তিনি তাঁর প্রত্নকম্রনন্দিনী পত্রিকায় এর বাঙলা অনুবাদ করেছিলেন সে খবরও আমাদের অজানা ছিল। মূল গ্রন্থটিতে (রচনা ১৬ শতক) পুরাণের প্রসঙ্গে মধুসূদন বায়ুপুরাণের উল্লেখ করেননি অথচ

ব্রহ্মবৈবর্তের নাম করেছেন , এটি লক্ষ্য করার মত। মধুসূদন বাৎস্যায়ন কামশাস্ত্রের কথা জানতেন, আয়ুর্বেদ ও ধনুর্বেদের কথা অনেক বলেছেন। কিন্তু অর্থশাস্ত্রকে ভাসাভাসা ভাবে শুধু নীতিশাস্ত্র বলায় মনে হয় তখন কৌটিল্য প্রচলিত ছিল না। অশ্বশাস্ত্র, গজশাস্ত্র এবং সূপশাস্ত্রের (রন্ধন-বিদ্যা) কথাও তাঁর জানা ছিল। আধুনিক পাঠকেরা স্তোত্র সাহিত্যকে প্রায় উপেক্ষা করেন, তাই মনে হয়—ঐ অনুপম স্তোত্রটি পরিশিষ্টে দিলে যেন বইটি সর্বাঙ্গসুন্দর হোত। পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ বহু পরিশ্রমে ত্রিশটি টীকার উল্লেখ করে বহুকাল আগে মহিম্নঃস্তোত্রের একটি অতি মূল্যবান সংস্করণ প্রকাশ করেন। এখানে গ্রন্থবিবরণীতে সেই দুষ্প্রাপ্য বইটির উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের ভূমিকাটি মূল্যবান। এমন একখানি উপাদেয় গ্রন্থের লেখক ও প্রকাশককে সাধুবাদ দেওয়া আমরা কর্তব্য বলে মনে করি।

কল্যাণী দত্ত

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার লোকশিল্প ॥ সত্যানন্দ মণ্ডল। ফার্মা কে. এল. এম. প্রাইভেট লিমিটেড/কলকাতা ১২ ॥ দাম : কুড়ি টাকা ॥

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার লোকশিল্প নিয়ে মোট দশটি প্রবন্ধ এই গ্রন্থে বিন্যস্ত হয়েছে। মোট ১২৮ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে লেখক আন্তরিকতার সঙ্গে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার লোকশিল্পের পরিচয় তুলে ধরেছেন। প্রথমে লোকশিল্পের সংজ্ঞা নির্ণয় করে লেখক দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার পরিচিতি দিয়েছেন। তারপর মৃৎশিল্প, দারুশিল্প, পট, মন্দির, মসজিদ, কাঁথা, শোলাশিল্প, শঙ্খশিল্প, আরও কয়েকটি লোকশিল্প অংশে পাতাশিল্প, বেনাকাঠি, হোগলা, পালকশিল্প, পাট, ইত্যাদি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন।

লোকশিল্পের সঙ্গে সমাজের প্রয়োজন, শ্রম, দেশজ, ঐতিহ্য, দর্শন, শিল্পভাবনা, অর্থনীতি কেমনভাবে জড়িয়ে আছে লেখক নিষ্ঠার সঙ্গে তা' বিবৃত করেছেন। তবে জনবিন্যাস বা লোকসমাজ প্রসঙ্গে আলোচনা স্বল্প পরিসরে সমাপ্ত করেছেন। প্রবন্ধগুলি প্রাথমিকভাবে বিচ্ছিন্ন মনে হলেও এদের মধ্যে যে অখণ্ড ঐক্য বর্তমান লেখক সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

মৃৎপাত্রের সঙ্গে মানব সভ্যতার যে নিবিড় সম্পর্ক বর্তমান এবং মৃৎশিল্পের আবিষ্কার কিভাবে মানুষের জীবন প্রণালী ও অর্থনীতি নির্মাণে সহায়তা করেছে সত্যানন্দবাবু সংক্ষেপে সেকথা আমাদের জানিয়েছেন। মৃৎপ্রদীপের সঙ্গে নারী-শক্তি বিষয়ক ধারণা কিভাবে যুক্ত হয়েছে লেখক সে দিকটাও সরসভাবে তুলে ধরেছেন। প্রজননশক্তি, উর্বরতাবাদ, জাদু লোকশিল্পকে কতটা প্রভাবিত করেছে তিনি আমাদের সেদিকে আকর্ষিত করেছেন। মৃৎশিল্পের আদিমতা ও শিল্পতত্ত্ব আরো একটু বিস্তৃত হলে পাঠকের কৌতূহল তৃপ্ত হতো বেশি।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার পুতুল-প্রতিমা নিয়ে লেখক মনোজ্ঞ প্রত্নতাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন। লৌকিক দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণ ও তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনাটি সংক্ষিপ্ত অথচ মূল্যবান। মৃৎ-শিল্পের বাজারের সঙ্গে ধর্মের যোগসূত্রটিও সুন্দরভাবে আলোচিত হয়েছে। (পৃঃ ২৩)॥ মন্দির টেরাকোটা অংশটি সংক্ষিপ্ত হওয়ায় দক্ষিণ ২৪ পরগণার সব কটি মন্দিরের প্যানেল আলোচনায় স্থান করে নিতে পারেনি। তবুও সত্যানন্দবাবু সুন্দরভাবে স্বল্পপরিসরে বিষয়টি আলোচনা করেছেন।

পুতুলনাচের দারুপুতুল ও মন্দিরের দারু ভাস্কর্য আলোচনাংশটি খুবই চিত্তাকর্ষক এবং তথ্যবহুল। রথের আলোচনায় প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য ও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য আরো বিস্তৃত আলোচনার দাবী করে। 'বেরসো কাঠ' বা বৃষকাষ্ঠের আলোচনা তথ্যবহুল। পটের সুবিস্তৃত আলোচনা গ্রন্থটির অন্যতম আকর্ষণ। লেখক লিখেছেন; 'পটের একদিকে আছে যেমন মায়া, অন্যদিকে তেমনি বিস্ময়।' (পৃঃ ৫১)।' মন্তব্যটি সর্বাংশে সত্য। লোকশিল্পের বিভিন্ন আঙ্গিকে এই 'মায়া' ও 'বিস্ময়ের' দোলাচলতা বর্তমান। জাদুক্রিয়া ও লোকাচার এই শিল্প ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বলে লোকশিল্প মায়াময়। তবে প্রাগ্রসর সমাজে বাস্তবতা ও সৌন্দর্য যুক্ত হয়ে পটকে (কালীঘাট/ বাঁকুড়ার পট) অনেকটা প্রাণশক্তি দিয়েছেন শিল্পীরা। কাঁথা এর অন্যতম দৃষ্টান্ত।

মন্দির, মসজিদ আলোচনা করতে গিয়ে লেখক গম্বুজ, খিলান, মিনার, দালান, চালা, ভদ্র, শিখর, রেখ প্রভৃতির কথা উল্লেখ করেছেন। এদের সঙ্গে বৌদ্ধ চৈত্য (বিহার) রীতির তুলনামূলক আলোচনা থাকলে আরো সমৃদ্ধ হতো আলোচনা। এই শিল্পের অলংকরণ ও শৈলী দক্ষিণ ২৪ পরগণায় যে বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে, অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে যে সাদৃশ্য আছে সেটাও উল্লেখ করলে বিশ্লেষণ মনোজ্ঞ হতো। 'মোটিফ' ফুল কেমন করে রূপ থেকে রূপান্তরে সঞ্চারিত, স্থানান্তরিত হয়েছে সেদিকে আমাদের দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। সমকালীন শিল্পের ধারার সঙ্গে যেমন অতীতের ঐতিহ্যে যোগ আছে, তেমন কালের প্রয়োজনে এসে যায় নব নব বিষয় ও বস্তুবিন্যাস। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কলাকর্মের প্যাটার্ন বিকিরিত হয়, সঞ্চারিত হয় মনে মনে, শিল্পের অশরীরী মননে। লেখক যথেষ্ট মনোযোগের সঙ্গে সেদিকে লক্ষ্য রেখেছেন।

শঙ্খ ও শোলা আমাদের দেবাঙ্গনে স্থান করে নিয়েছে পবিত্র সামগ্রীরূপে। দেবতার আসনে এদের স্থান নির্ণীত হয়েছে। কখনও মানুষের অঙ্গে, আবার কখনো দেবতার প্রসাধনে, অর্চনে সজ্জনে এদের স্থান। দেবতা-মানুষের সঙ্গে শিল্প সামগ্রীর এমন অপূর্ব সংযোগ অন্যত্র দুর্লভ। লেখক এই দুটি শিল্পের রসঘন পরিচয় দিয়েছেন আলোচ্য গ্রন্থে। পাতা শিল্পের বর্ণনায় শিল্পীদের জীবন ও জীবিকার সমীক্ষাও তিনি করেছেন। শিল্পীদের পরিচয় যুক্ত হওয়ায় তাঁর বর্ণন অনেকটা প্রাণবন্ত।

লোকশিল্পের বিকাশে ব্যক্তি প্রতিভাকে আমরা উপেক্ষা করতে পারিনা। কারণ শিল্পের 'ঘরানা' অঞ্চল বিশেষে, পরিবার বিশেষে স্বতন্ত্র। পাঁচমুড়ার ৺রাসবিহারী কুম্ভকারের ধীর সচকিত অথচ গতিবেগসম্পন্ন প্রাণবান বিখ্যাত 'পাঁচমুড়ার' ঘোড়া একমাত্র তিনিই রূপ দিতে পেরেছেন। অন্যদের হাতে সে গতিবেগ সৃষ্টি সম্ভব হয়নি। সোঁদরা, কেয়াবতী, মুরলুর বা সোনামুখীর ঘোড়ার ধারা স্বতন্ত্র। কাজেই ব্যক্তি প্রতিভার স্বর্ণরাগে গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের প্রযত্ন ও পারিপাট্য অন্যত্র বিরল। কারণ প্রতিভা সর্বত্রচারী নয়। সমাজের সমষ্টি ক্রিয়া স্থূলতায় পথ হারায়। যেমন হারিয়েছিল কবিওয়ালারা। অথচ ভোলা ময়রা, এন্টুনি ফিরিঙ্গি অমর, অনন্ত। 'দক্ষিণ ২৪ পরগণার লোকশিল্প' গ্রন্থের পরিকল্পনা ভালো। রচনার প্রাঞ্জলতা প্রশ্নাতীত। গ্রন্থটির প্রচার ও সমাদর কামনা করি।

দুলাল চৌধুরী